ড. হাসসান শামসি পাশা

সুখী জীবনের মুলমন্ত্র

সুখের সোনালি সোপান

সুখী জীবনের মুলমন্ত্র

ড. হাসসান শামসি পাশা

দারুত তিবইয়ান

অর্পণ

সত্য বলে দেওয়া আয়নাটির প্রতি
গাড়ির সাইড-ভিউর আয়নায় সবকিছু
এর প্রকৃত আকারের চেয়েও ছোট দেখায়...
আয়নার বলে দেওয়া এই সত্যকে যে অগ্রাহ্য করে
তার জন্য অপেক্ষা করে অঘটন...

প্রকাশকের কথা

সবাই সুখী হতে চায়। ছোট-বড়, ধনী-গরীব সবাই চাই ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীতে সুখী হতে। কিন্তু কেউ সুখের নাগাল পায় কারোর সুখ থেকে যায় অধরায়। এর কারণ কী জানেন?

কারণ, আমরা সুখী হতে চাই। কিন্তু সুখের সঠিব চাবিকাঠি খুঁজি না। নিজের মতো করে জীবনকে সাজাতে চাই। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন সাজাই না। নিজের মতো করে চিন্তা করি। আল্লাহর বিধানের রঙে নিজেকে রাঙাই না।

তাই সুখ আমাদের অধরায় থেকে যায়। সুখের নাগাল পাই না। যারা পান বা পেয়েছেন; কীভাবে তারা পেলেন! সুখের সঠিক চাবিকাঠী তাহলে কোনটি? সেটিই তুলে ধরেছেন আরবের এই বিখ্যাত লেখক ড. হাসসান শামসি পাশা।

তিনি আগে দেখিয়েছেন আসলে সুখ কোথায়? এরপর তুলে ধরেছেন ঈমানই মানুষের প্রথম ও প্রধান সুখের উৎস। ধারাক্রমে দেখিয়েছেন অন্যকেও কীভাবে আপনি সুখী করতে পারবেন। বৈবাহিক সুখের মুলমন্ত্র। সবশেষ তুলে ধরেছেন সুখ দূরকারী দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর কেন্দ্রবিন্দু। আল্লাহ লেখককে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বইটি অনুবাদ করেছেন খোবাইব আহমাদ সাঈদ। আল্লাহ তাকেও উত্তম বিনিময় দান করুন।

সম্পাদনা করেছেন তিবইয়ান সম্পাদনা টিম। বানান সমন্বয় করেছেন মাকামে মাহমুদ। আল্লাহ তাদেরও উত্তম বিনিময় দান করুন।

অতএব, বরাবরের মতোই আমি বলব, এ কাজে যা-কিছু ভালো ও কল্যাণকর, তার সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর অসুন্দর যত, তা কেবল আমাদের সীমাবদ্ধতা। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—প্রকাশক

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.

ভূমিকা

মানুষ যদি জীবনটাকে যথাযথভাবে চিনত, তাহলে তাতে খোঁজে পেত সুখ এনে দেওয়ার মত হাজারো উপকরণ। এমনকি এসব উপকরণ পরপারে যাবার আগেই ইহজীবনেও তার হাতে এনে দিতে পারে সুখময় জান্নাত।

কখনো সখনো তো মানুষ আনমনা হয়ে ভাবতে থাকে— আমার জীবনের মাকসাদ কী? জীবনের মাকসাদ কি সম্পদ সঞ্চয় করা, না পদমর্যাদা লাভ করা, কিংবা ক্ষমতা ও দাপট অর্জন করা? নাকি এমন এক অবস্থায় পৌঁছে যাওয়াই জীবনের লক্ষ্য যেখানে উপভোগ করতে পারব সর্বপ্রকার সুখ শান্তি এবং আস্বাদন করতে পারব সফলতা ও আধিপত্যের বিপুল স্বাদ? না জীবনের উদ্দেশ্য তাকওয়া ও আল্লাহভীতি; যা আমাকে করবে সৃষ্টিকর্তার নিকটবর্তী এবং যার কল্যানে প্রশান্তির সাগরে ডুবে থাকবে আমার অন্তরাত্মা।

অনেক ধারণাকারী ধারণা করে বলে— সুখ এমনি একটি শব্দ যার কোন বাস্তবতা নেই। সুখ কল্পনা প্রসূত একটি বিষয়, বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়না। স্পষ্টতই এ শ্রেণির লোকেরা অজ্ঞ এবং প্রতারণার শিকার। কারণ, এটা তো কোন অবস্থাতেই যৌক্তিক হতে পারে না যে, আমাদের সকলে হতভাগ্য ও দুর্ভাগা হওয়ার জন্য মহামহিম আল্লাহ নেয়ামত বরকত ও কল্যানরাজিতে ভরপুর সুবিশাল এ পৃথিবীতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কি করেই বা এটা যুক্তির কথা হতে পারে; অথচ আল্লাহ নিজেই তার প্রিয় রাসুলকে সম্বোধন করে বলেছেন—

ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى

আমি আপনার উপর এ জন্য কোরআন অবতীর্ণ করি নি যে, আপনি হতভাগ্য হবেন। [সুরা ত্বহা, আয়াত : ২]

অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন—

فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل و لا يشقى

যদি তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত এসে যায়, সুতরাং তখন যে আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে সে হবে না বিপথগামী এবং হবে না হতভাগ্য। [সুরা ত্বহা, আয়াত : ২৩]

তাছাড়া তিনি নিজেও তো দুর্ভাগাদের নরকের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন—

فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق

সুতরাং যারা হতভাগা হবে তারা থাকবে জাহান্নামে। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে বিকট ও গম্ভীর আওয়াজ। [সুরা হুদ, আয়াত : ১০৬]

একইভাবে তিনি জান্নাতকে নির্দিষ্ট করেন সৌভাগ্যবানদের জন্য। সুতরাং তিনি এরশাদ করেন—

و أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات و الأرض

আর যারা সৌভাগ্যশীল হবে তারা থাকবে জান্নাতে। সেথায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে, যতদিন পর্যন্ত আসমান এবং জমিন বিদ্যমান থাকবে। [সুরা হুদ, আয়াত : ১০৮]

এটা তো স্পষ্ট যে, সৌভাগ্য এবং সুখ এদের হাতেই বিদ্যমান। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে অক্ষম।

রোমের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ইপিক্টিটুস বলেন— "যে ব্যক্তি অসুখী হয় সে যেন কাউকে তিরস্কার না করে। কারণ, তার অসুখী হওয়ার পেছনের কারন সে নিজেই। কেননা, আল্লাহ তো মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সুখী হতে। অসুখী হতে নয়। কল্যান ও মঙ্গল তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আর অমঙ্গল ও অকল্যান ; সেটা তো আমাদের নিজেদের কারণেই হয়। আর বাস্তব সত্য

হল, আমাদের অবস্থা কিংবা পরিস্থিতি নয় বরং আমাদের স্বভাবই আমাদের হয়ত সুখী করে অথবা করে অসুখী ও হতভাগা।"

পৃথিবীতে কী শুধুই কল্যান আর কল্যান নাকি শুধুই অকল্যান আর অকল্যান? আরবি শব্দ بؤس (যার অর্থ দুঃখ কষ্ট) শব্দটির শেষে কি সীন থাকার ফলেই এর বিপরীত সাআদাত (سعادت যার অর্থ সুখ) শব্দটির সূচনা হয়েছে সীন দ্বারা? আমাল (أمل যার অর্থ আশা) শব্দটির মাঝে মীম কি এ জন্যই এসেছে যে, এর বিপরীত আলাম (ألم যার অর্থ যাতনা ও কষ্ট) শব্দটি শেষ হয়েছে মিম দ্বারা? হ্যাঁ, এমনই হয়ে থাকে জীবনের নীতি এবং পৃথিবীর রীতি। কারণ, বস্তুকে তো চেনা যায় তার বিপরীত বস্তুসমূহের দ্বারা। তাই তো অসুখ না থাকলে সুখেরও অস্তিত্ব হত না। যেমন রাত না থাকলে দিন হত না এবং অন্ধকার না থাকলে আলোর কোন উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হত না।

সুখী ও ভাগ্যবান তো সেই যে জানে, সে কিভাবে নিজেকে নিয়ে তুষ্ট থাকবে। কারণ, সুখ তো সম্পদ ও তা উপভোগ করার নাম নয়। খ্যাতি ও সুখ্যাতিকেও সুখ বলে না। প্রেম ভালোবাসা ও তার স্বাদকেও সুখ আখ্যা দেয়া যায় না। জ্ঞান এবং তার আলো ও উপকারিতা কিংবা মূর্খতা এবং তার কারণে সৃষ্ট স্থবিরতা ও বিপদাপদ দ্বারাও সুখকে সজ্ঞায়িত করা যায় না। সৌন্দর্য ও তার আবেদনের নামও কিন্তু সুখ নয়।

উপর্যুক্ত কোনটাকেই স্বতন্ত্রভাবে সুখ বলে না। এমনকি এগুলোর সমন্বিত রূপকেও নয়। বরং সুখী মানুষ নিজেকে সুখী মনে করাটাই হলো প্রকৃত সুখ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সুখের এমন কিছু মূহুর্ত আছে যেগুলো কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। সেই মূহুর্তগুলোকেই উপলব্ধি করে আপন রবের সামনে বিনয়াবনত হয়ে ইবাদতরত ব্যক্তি, বিজ্ঞানী নতুন কোন কিছু আবিষ্কার করলে, প্রার্থী তার গন্তব্যে পৌঁছলে, ডাক্তার তার রোগীকে ট্রিটমেন্ট করে সুস্থ করতে পারলে, শ্রমিক তার কর্ম সম্পাদন করলে, স্ত্রী তার কিউট নবজাতকের গুনগুনানী শুনতে পেলে এবং গৃহকর্তা তার সুস্থ সবল হাস্যোজ্জ্বল সন্তানদের মাঝে থেকে।

বস্তুত হে পাঠক, আপনি তো এমন এক পরিবেশে অবস্থান করছেন যা আপনার প্রতি আল্লাহর নেয়ামতরাজিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু মানুষের জন্য

অপরিহার্য হল, তার উপর আল্লাহর এসব নেয়ামত ও অনুগ্রহ অনুধাবন করা। বহু মানুষ আছে যারা কেবল তার প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের কথা তখনই অনুধাবন করতে পারে যাখন কোন একটি নেয়ামত থেকে সে বঞ্চিত ও মাহরুম হয়।

ড. মোস্তফা সিবাঈ রহ. বলেন—

"বছরে একবার আদালত প্রাঙ্গন ঘুরে আসবে। যাতে করে তুমি বুঝতে পার, সচ্চরিত্রের ক্ষেত্রে তোমার উপর মহান রবের কতটা দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে।

মাসে একবার হাসপাতালে বেড়িয়ে আসবে। যাতে করে তুমি জানতে পার, সুস্থতা ও রোগের ক্ষেত্রে তোমার প্রতি আল্লাহ কতটা অনুগ্রহ ও দয়া করেছেন।

সপ্তাহে একবার বাগান প্রদক্ষিণ করবে। যাতে করে অনুভব করতে পার, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে তোমার উপর আল্লাহর দান কত অপরিসীম।

দৈনিক একবার লাইব্রেরি পরিদর্শন করবে। যাতে তুমি উপলব্ধি করতে পার, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে আল্লাহর কতটা অনুগ্রহ ও দয়া তোমার উপর বিদ্যমান।

আর তোমার রবের সাথে সাক্ষাত করবে প্রতিটি মূহুর্তে। যাতে অনুধাবন করতে পার, জীবনের নেয়ামতরাজিতে তোমার রব তোমার প্রতি কত বিশাল দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন।"

সুতরাং অল্পতেই তুষ্ট হও। তাহলেই সুখী হবে। নিজের কাছে হও মহান আর মানুষের কাছে হও সম্মানিত। সহজ ও সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হও। প্রাচুর্যশালী হয়ো না। আপতিত বিপদাপদে সাচ্ছন্দ্য ও সাহসিকতার সাথে সবর কর। পরাজয়কে মেনে নাও এমনভাবে যেন তা তোমার প্রিয় বস্তু। বিজয়কে বরণ করে নাও এমনভাবে যেন তা তোমার কাঙ্ক্ষিত বিষয়। শুধু ভালো কাজের চিন্তা করবে। সম্মানজনক কথাই বলবে। কারো সাথে হিংসে করবে না। কারণ, যাকে নিয়ে তুমি হিংসা করছ, যদি তার দুঃখ-কষ্টের ফিরিস্তি তুমি জানতে তাহলে তার প্রতি দয়াপরবশ হতে এবং নিজেকে নিয়ে তোমার হিংসা হত। তুমি তো কেবল তখনই সুখী হতে পারবে যখন নিজের প্রতি পরিতুষ্ট থাকবে। এতে করে তুমি প্রশান্তি লাভ করবে এবং আত্মিকভাবে শান্তি বোধ করবে। কিন্তু তুমি যখন নিজেকে নিয়ে অনুসন্ধান করবে তখন সবসময় সবকিছুকে নিজের জন্য সন্তোষজনক পাবে না। কারণ, তোমার তো করণীয় ছিল অনেক কিছু। কিন্তু তুমি কতইনা কম

করেছ। আর তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে নিজের মধ্যে এমন অনন্য কিছু গুণের সমাহার, নিজেকে সুখী করতে সেগুলোর উন্নয়ন করা তোমার জন্য অতিব জরুরী।

প্রকৃত মুমিন ভালোভাবেই জানে যে, দুনিয়ার ভোগ্যবস্তু ক্ষণিকের। পদমর্যাদা অর্থকড়ি চাকচিক্য—এসবের কোন শুভ পরিণতি নেই। ফলে সে আপন রবের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টায় দৌড়ে বেড়ায় এবং রব তাকে এই জগতে যা কিছু দিয়েছেন তা নিয়েই তুষ্ট থাকে। দুনিয়ার জন্য এমনভাবে কাজ করে যেন সে তাতে সর্বদা থাকবে। আর পরকালের জন্য এমনভাবে পরিশ্রম করে যেন আগামীকালই তার মৃত্যু হবে।

সুতরাং সুখ তো পাওয়া যায় আল্লাহর আনুগত্যে, মানুষে মানুষে ভালোবাসার মধ্যে, দরিদ্রকে সাহায্য করা ও আহত ব্যক্তির দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে। পতিত ব্যক্তিকে উঠিয়ে দেওয়ার মধ্যে, ক্ষুধার্তকে অন্যদান এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান ও দয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকে দয়া প্রদর্শনের মধ্যেও সুখ নিহিত আছে।

সারকথা হল— একজন মানুষকে পরিপূর্ণ সুখ পেতে করণীয় হল, শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়া, সহজসরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া, আচার-ব্যবহারে সন্তোষজনক হওয়া, পরকালীন বিষয়ে সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া। কেউ এরূপ হলে তবেই সে সুখী হতে পারবে। অন্যথায় সে সুখী নয়।

কোন এক বিশেষজ্ঞ বলেছেন— প্রিয় বৎস আমার, দিনে কিংবা রাতে তোমার যেন এমন একটা সময় বরাদ্দ থাকে, যে সময়টিতে তুমি তোমার পালনকর্তা ও সৃষ্টিকর্তার দিকে মনযোগী হবে। চিন্তা করে নিজের শুরুটা কী ছিল এবং শেষটা কেমন হবে। নিজের জীবনের কেটে যাওয়া দিনগুলোর হিসেব নিবে। যদি ফলাফল ভালো মনে হয় তাহলে শুকরিয়া আদায় কর। আর খারাপ মনে হলে চেষ্টা চালিয়ে চাও আর সবর কর। অধিকাংশ অবস্থায় সব সময় আল্লাহ অবশ্যই স্মরণ করবে। কারণ, তিনি এরশাদ করেন,

واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। যাতে করে তেমরা সফলকাম হতে পার। [সুরা জুমআ, আয়াত : ১০]

এই গ্রন্থটিকে আমি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ : সুখ কোথায়? এ শিরোনামে আমরা আলোচনা করেছি সুখ কী অর্থ-সম্পদে, না পদমর্যাদায়, বা কাজকর্মে কিংবা অন্য কোন ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঈমানই প্রকৃত সুখের উৎস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অপরকে সুখী করার পদ্ধতি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বৈবাহিক সুখ। কিভাবে আপনি আপনার স্ত্রীকে এবং আপনার স্ত্রী আপনাকে সুখী করবে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সুখ দূরকারী দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি— তিনি যেন গ্রন্থটিকে উভয় জাহানের সুখের কারণ বানান পাঠকের জন্য, প্রকাশকের জন্য এবং লেখকের জন্যও। আর আল্লাহই সরল পথের দিশারী।

—ড. হাসসান শামসী পাশা
১৫সফর১৪২১হিজরী
১৯ মে ২০০০ ঈসায়ী
জেদ্দা নগরী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সুখ কোথায়?-২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুখের উৎস ঈমান-৪১

শেষ অধ্যায়

হতাশা ও দুশ্চিন্তা-১১৩

সুখের সোনালি সোপান

সুখী জীবনের মূলমন্ত্র

প্রথম অধ্যায়

সুখ কোথায়?

সৌভাগ্য মানুষের হারিয়ে যাওয়া বস্তু। পরম ও আকাঙ্ক্ষিত জিনিস। মানুষ সর্বদা যার পেছনে ছুটে চলে এবং সর্বত্র যা সে খুঁজে বেড়ায়। ব্যক্তিভেদে এর পন্থা যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তেমনি স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় তাদের স্বভাব, ঝোঁক, পরিবেশ ও বিশেষ পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে।

আমরা কতভাবেই না কামনা করি যে, সুখের কল্পনাটি সহজ হোক এবং তা অর্জন করাটা যেন আরও সহজতর হয়। আমরা আরও আশা করে থাকি যে, সুখ অর্জনের জন্য আমাদের একটি ডাক্তারি ব্যবস্থাপত্রই যদি যথেষ্ট হতো! কিন্তু হায়, তা যে সোনার হরিণ!

সুতরাং আপনি এমনভাবে সুখ তালাশ করবেন না, যেন এটি একটি মুদ্রা; যা আপনার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেছে অথবা আসবাবপত্রের মাঝে হারিয়ে গেছে। ফলে আপনি বাজারেও যেতে পারছেন না এবং এমন কোনো বিক্রেতাও তালাশ করে পাচ্ছেন না, যে আপনার কাছে মখমলের তৈরি দৃষ্টিনন্দন একটি থলেতে করে সুখ বিক্রি করবে।

সুখ কী জিনিস—এর ব্যাখ্যা নিয়ে মানুষ যতটা মতপার্থক্যে লিপ্ত হয়েছে, দ্বিতীয় কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এতটা মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়নি। এর একমাত্র কারণ হলো, সুখ—একটি আপেক্ষিক বিষয়।

তাই তো আমরা দেখতে পাই, কোনো একটি বিষয় একজনের চোখে ভালো ও উত্তম মনে হয়। ফলে সে এটিকেই সুখ জ্ঞান করে এবং এর অর্জনকারীকে ভাবে সুখী। পক্ষান্তরে একই বিষয় আরেকজনের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, যে এটিকে অ-সুখ ভাবছে এবং এতে বুঁদ হয়ে থাকা ব্যক্তিকে অসুখী ও হতভাগা মনে করছে।

আবার কিছু মানুষ মনে করে, সুখ হলো ইচ্ছেমতো পানাহার ও খেলাধুলা করা, মনের চাহিদামাফিক পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার এবং প্রমোদশালা ও বিনোদনকেন্দ্রে বিপুল সময় কাটানো। কেউ কেউ তো সুখ অনুভব করে পড়াশোনা ও অধ্যয়নে, মণিমুক্তাতুল্য জ্ঞান আহরণে ডুবে থাকতে এবং সাহিত্যের গহিন অরণ্যে পদচারণ করতে।

কিছু কিছু মানুষ তো এই নশ্বর জগৎ থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া এবং এ পৃথিবীর আসবাবপত্র থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করার মধ্যেই সুখ খুঁজে পায়। কারো কারো কাছে মনে হয়, মানুষকে নিজের প্রবৃত্তির পূজারি বানানো এবং তাদেরকে নিজের বাসনা পূরণের কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা এবং নিজের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করার মধ্যেই সুখ নিহিত আছে।

শারীরিক চাহিদা মেটানোর মধ্যেই সুখ আছে বলে কিছু লোক ধারণা করে। ফলে তারা আপন প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে জীবনধারণ করে। তাই তো সে পাপিষ্ঠদের সাথে ভাব জমায় এবং নির্বোধ ও চপলবুদ্ধির লোকদের সাথে উঠাবসা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কখনো বিপাকে পড়ে সে হারাম ও অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জনের পথও বেছে নেয় এবং ভোগবাদী জীবনের প্রতি আসক্তি তাকে নিষিদ্ধ ও হীন কাজে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে।

কিছু লোক তো ভাবে, সম্পদ সঞ্চয়ের মধ্যেই বুঝি সুখ আছে! তাই আপনি দেখতে পাবেন, সে সম্পদ সঞ্চয় করে এবং চরম কার্পণ্য করে চলে। এতে সে নিজের ও পরিবার-পরিজনের হক আদায় করতে পারে না। আবার কখনো কোনো রোগ দেখা দিলে সম্পদ সঞ্চয়ের লোভে সে চিকিৎসা থেকে বিরত থাকে। পরিবার-পরিজনের সাথে অভাবী ও দরিদ্রদের মতো জীবনযাপন করে। পরনে থাকে জরাজীর্ণ পোশাক। পেট থাকে ক্ষুধার্ত। আর মানসিকতা থাকে চরম হীন ও নিকৃষ্ট।

আবার কারো কারো থাকে অধিক পরিচিত ও সুখ্যাতি। তাই সে মানুষের ওপর বড়াইগিরি ও দাম্ভিকতার মধ্যে সুখ হাতড়ে বেড়ায় এবং মানুষকে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখতে পছন্দ করে। কিছু কিছু মানুষের অবস্থা তো এমন, তাদের কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। নেই তেমন কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষাও। যৎসামান্য পরিশ্রমেই তারা ক্ষান্ত থাকে। ফলে অলসতা তাদের মধ্যে আবাস গড়ে তোলে, তাদের কর্ম স্থবির হয়ে পড়ে এবং তাদের অবস্থার চরম অবনতি ঘটে!

১. বাস্তবতা থেকে পলায়নের মধ্যেই কি সুখ?

কিছু কিছু মানুষ তো বিভিন্ন পন্থায় জীবন থেকে পলায়ন করার মধ্যে নিজেদের সুখ খুঁজে পায়। এ লোকদের দৃষ্টিতে জীবনটি হলো অসহনীয় এক বোঝা এবং জীবিকা উপার্জন তাদের কাছে শরীরের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা, বন্ধুত্বসহ

সর্বপ্রকার ভালো গুণাবলি তাদের বিশ্বাস মতে কল্পিত বিষয়; শুধু কল্পনার জগতেই যার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এসব বিষয় থেকে বাঁচতে তারা জীবনটাকে ভুলে যাওয়ার নানাবিধ মাধ্যম বেছে নেয়। কখনো শূন্যে প্রাসাদ নির্মাণের দিবাস্বপ্ন দেখে। কখনো-বা তলানি পর্যন্ত কয়েক ঢোক মদ পান করে কিংবা মাদক সেবনে আসক্ত হয়ে পড়ে। উভয় বিষয়ই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সর্বনিকৃষ্ট ও হীন লোকদের কাতারে নিয়ে যায়।

কিছু মানুষ এ সময় ব্যথানাশক ওষুধ গ্রহণ করে। সে ভাবে, এ ওষুধ তার পরিশ্রান্ত দেহে আরামের সঞ্চার করবে এবং ক্লান্ত স্নায়ুসমূহ থেকে ক্লান্তি দূর করে দেবে।

অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো, এসব ওষুধের আজ বড্ড অপব্যবহার করা হয়। অথচ এগুলোর মৌলিক উদ্দেশ্যই হলো, বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট এক অবস্থার চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা। উপযুক্ত ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়া যারা এসব ব্যথা উপশমকারী ওষুধ সেবন করে, তারা নিজেরাই নিজেদের আসক্তি ও ভয়াবহ বিপদের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করছে!

কাতারের ড. আমির ১৯৫৭ সালে 'হিলাল ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত তার এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন—

> বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, ঐ সকল ধনকুবের যারা আমেরিকার ফ্লোরিডা ও ফ্রান্সের রেভেরাসহ আরও অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করে, তারা কিন্তু সেসব ভূখণ্ডের সৌন্দর্য উষ্ণতা বিনোদন ছায়া উপভোগ করেই ক্ষান্ত থাকে না। বরং তারা ডাক্তার ও ফার্মেসিতে গিয়ে ক্লান্তিনাশক ওষুধ খায় এবং এক সফরেই কয়েক বোতল নেশা গলাধঃকরণ করে নেয়।

আমি বলি—তাদের এসব বিষয় বিস্ময়কর হওয়ার পেছনের রহস্য হলো, এদের ব্যাপারে ধারণা করা হয়, সুখ ও সৌভাগ্যের যাবতীয় উপাদান—অর্থসম্পদ, প্রকৃতি, আবহাওয়া, আনন্দ-বিনোদনের সকল উপকরণ, পানি এবং সজীবতা; সবকিছুই তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু এতকিছুর পরও তারা মানুষের বানানো মাধ্যম গ্রহণ করে এত অধিক সুখ লাভের নেশায়, যার অস্তিত্ব কেবল তাদের কল্পনা ও স্বপ্নের জগতেই পাওয়া যায়। অন্য কোথাও নয়।

বাস্তবতা হলো, এ সমস্ত লোক কোলাহলপূর্ণ এবং আসক্তি ও ভোগের জীবন থেকে পলায়ন করতে চায়। আর এভাবেই তারা মূলত তাদের অজান্তেই সুখ থেকে দূরে সরে যায়।

এদের অবস্থা হলো এমন, যেমন এক লোক নিজের কাছেই আগুন জ্বলতে দেখলো। কিন্তু সে আগুন নেভানো কিংবা তার থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা তো করলোই না; উলটো না দেখার ভান করে তাতে জ্বালানি (লাকড়ি) নিক্ষেপ করে বসলো!

২. ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্যেই কি সুখ নিহিত?

একটি গোষ্ঠী এমনটিই মনে করে। তাদের ধারণা, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবনেই বুঝি সুখ নিহিত আছে। পর্যাপ্ত অর্থকড়ি ও বিলাসী জীবনযাপনেই সুখের দেখা মেলে। কিন্তু যেসকল দেশ জীবনযাত্রার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত এবং যেখানে বস্তুবাদী জীবনের চাহিদা ও প্রয়োজন সহজলভ্য, সেসকল রাষ্ট্রই নিয়মিত জীবনের অশান্তি ও শূন্য আত্মার অভিযোগ করে আর খোঁজ করতে থাকে—সুখ লাভের ভিন্ন কোনো পথ ও পন্থা।

সুতরাং এ কথা উপলব্ধি করতে কোনো বেগ পেতে হয় না যে, সম্পদের আধিক্য সুখ হতে পারে না। বরং কখনো কখনো তো অধিক সম্পদ সম্পদশালীর জন্য পরকালের আগে ইহজগতেই বিপদ ও অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা একদল মুনাফিকের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

فلا تعجبك أموالهم و لا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحيوة الدنيا .

(হে নবি) সুতরাং তাদের অর্থসম্পদ এবং সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে আকৃষ্ট না করে। (কারণ) আল্লাহর ইচ্ছা হলো, এর মাধ্যমে ইহজীবনেই তাদের তিনি শাস্তি দেবেন। [সুরা তাওবা, আয়াত : ৫৫]

আয়াতে শাস্তি বলতে উদ্দেশ্য হলো—দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-পেরেশানি ও অসুস্থতা। হুবহু এ চিত্রটি আমরা এমন অসংখ্য লোকের মাঝেই প্রত্যক্ষ করি, যারা সম্পদ উপার্জন ও দুনিয়া কামাই করাকে নিজেদের সবচেয়ে বড় চিন্তা ও চূড়ান্ত আশার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে। তাই সে আত্মিকভাবে সর্বদা চাপের মধ্যে থাকে। অনন্তর থাকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। সদা পেরেশানিতে ডুবে থাকতে দেখা যায়। তার মধ্যে না আসে কোনো স্থিরতা আর না দেখা যায় কোনো সুখকর অবস্থা।

এ মানসিকতারই চিত্রায়ন করতে গিয়ে মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত হাদিস উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন—'আখিরাতকেই যে ব্যক্তি নিজের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে নেবে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্য ঢেলে দেন এবং এবং তাকে একাগ্রতা দান করেন; তখন দুনিয়া তার কাছে এলেও সে থাকে তার প্রতি অনাগ্রহী ও অনীহ। আর যে লোক দুনিয়াকেই তার একমাত্র চিন্তার বস্তু বানিয়ে নেয়, আল্লাহ তার দারিদ্র্য তার দুচোখের সামনে তুলে ধরেন এবং তার চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে দেন। ফলে তার কাছে দুনিয়ার ততটুকুই আসে, যতটুকু তার জন্য বরাদ্দ করা হয়।'[১]

[১] সুনানুত তিরমিজি

সম্পদের সাথে মানুষের বোঝাপড়াটা আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে তখন, যখন সম্পদ মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করে নেয়। তাই সে সম্পদ উপার্জনের নেশায় কষ্ট ভোগ করে এবং তা ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কায় পেরেশানি অনুভব করে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন—'ধ্বংস হোক দিনার ও দিরহামের পূজারি এবং রেশমের কাপড় ও দামি দামি পোশাকের নেশায় পড়ে থাকা ব্যক্তি; যাকে দেওয়া হলে সে সন্তুষ্ট থাকে, আর না দেওয়া হলে থাকে অসন্তুষ্ট।'[২]

জার্মান আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ আর্নস্ট সিয়ার বলেন—অধিকাংশ মানুষ মনে করে, প্রাচুর্য ও ধনাঢ্যতা সুখ এনে দেয়। কিন্তু আমি বিষয়টিকে বিপরীত মনে করি। নিঃসন্দেহে মানবজীবনে এমন বহু আনন্দ ও সুখ রয়েছে, যেগুলো প্রাচুর্যের আনন্দ ও সুখের চেয়েও অনেক বড়। সুতরাং অধিক পরিমাণ সম্পদ কামাই করার মধ্যে এমন কিছু নেই, যা বিশ্বস্ত ও স্বামীভক্ত স্ত্রীর ভালোবাসা এবং সৌভাগ্যবান সন্তানদের নিয়ে আনন্দ করার স্বাদের সমতুল্য হতে পারে।

কিছু ধনকুবের কিন্তু প্রকৃতার্থে দরিদ্রদের চেয়ে কম অশান্তি ও কষ্টে নেই। এ সমস্ত লোকের একমাত্র দুশ্চিন্তা সুস্বাদু ও নামি-দামি খাবার গ্রহণ করা, যৌন তাড়না, উন্নতমানের আসবাবপত্র ও সবচেয়ে লেটেস্ট মডেলের গাড়ি সংগ্রহ করা এবং সর্বোন্নত পণ্য ক্রয় করা। তবে তারা যতই নিজেদের এই বাহ্যিক স্বাদ ও আরাম-আয়েশে ডুবিয়ে দিচ্ছে, তত দ্রুতই তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে, এ সুখ সামান্য কয়েক দিন কিংবা অল্প কয়েক ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হবে না এবং এ সুখ তাদেরকে বিরক্তির ক্ষতি থেকেও ফেরাতে পারবে না।[৩]

আগেকার এক বাদশার ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তৎকালে তিনিই ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী ও দুঃখী মানুষ। খাবার-দাবার থেকে শুরু যাবতীয় পছন্দনীয় জিনিস তার হাতের নাগালে থাকতো। কিন্তু এর পরও তিনি সুখ ও শান্তি অনুভব করতেন না।

সবচেয়ে দামি ও মূল্যবান খাবার তার সামনে হাজির করা হয়। এ খাবার খেয়েও তার বদহজম হয়। একদিন সেই বাদশার এক কাছের লোক তাকে প্রস্তাব দিলো, আপনি এক রাতের জন্য হলেও রাজ্যের সর্বাধিক সুখী লোকটির পোশাক পরিধান করে থাকুন। তাহলে আপনি সুখ অনুভব করতে পারবেন। প্রস্তাব অনুযায়ী বাদশার কর্মচারীরা সর্বাধিক সুখী লোকের অনুসন্ধানে নেমে পড়ে। এমনকি তারা সুখী লোক পেয়েও যায়। লোকটির চেহারা ছিল হাস্যোজ্জ্বল। সে ছিল অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং সুখী। তারা লোকটিকে ধরে বাদশার সামনে উপস্থিত করে। বাদশাহ লোকটিকে দেখতে পেয়ে

---

[২] সহিহুল বুখারি

[৩] মাজাল্লাতুল হিলাল, জানুয়ারি ১৯৫৪

আশ্চর্য হয়ে পড়ে। কারণ, সবচেয়ে সুখী লোকটি এতটাই দরিদ্র যে, পরিধান করার মতো পোশাকও তার কাছে নেই।

মানুষ সম্পদ চায় সুখের মাধ্যম হিসেবে এবং এর ভিত্তিতেই সে সম্পদের পেছনে ছুটে চলে। কিন্তু সম্পদ দিয়ে হাত পুরাবার আগেই সে ভুলে যায় সেই নীতির কথা, যার কারণে সে ছুটে চলে এবং এটিও সে ভুলে যায় যে, সে সম্পদকে সুখের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে মালসামানই তার লক্ষ্য হয়ে পড়ে এবং এর জন্যই সে দিনরাত দৌড়ে বেড়ায়। কখনো তো এমন হয় যে, সে হালাল-হারামেরও তোয়াক্কা করে না। উস্তাদ আবদুল্লাহ আল-জাইসানের ভাষ্যমতে, কখনো কখনো এমনও হয় যে, এ দৌড়াদৌড়ির নেশা তার আর কাটে না। এভাবেই একদিন সে স্ট্রোক করে এবং দৌড়ঝাঁপও থেমে যায়। অর্থাৎ এই দৌড়ঝাঁপই তাকে কবর পর্যন্ত নিয়ে যায়।

সুতরাং সম্পদ দিয়ে সুখ লাভের জন্য দুটি শর্ত—

এক. উপার্জিত সম্পদ হালাল হওয়া এবং নিজের শ্রম ও কষ্টে তা উপার্জন করা।

দুই. উপার্জিত সম্পদ কোনো অন্যায় কাজে ব্যবহার না করা। অন্যথায় এ সম্পদ মালিকের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দেবে।

৩. সুখ কি সন্তানাদির মধ্যে বিদ্যমান?

নিঃসন্দেহ সন্তান পার্থিব জীবনের চাকচিক্য ও সৌন্দর্য। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেন—

المال و البنون زينة الحيوة الدنيا

ধনসম্পদ ও সন্তানাদি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। [সুরা কাহাফ, আয়াত : ৪৬]

কিন্তু বহু সন্তান এমন আছে, যারা তাদের পিতার অবাধ্যতা করে। আবার বহু সন্তান এমনও আছে, যারা পিতার সম্পত্তি দখল করার মানসে নিজ হাতে জন্মদাতা পিতার মৃত্যুর ঘটায়!

কোনো এক কবি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আফসোস করে আপন ছেলের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কবিতাগুচ্ছ আবৃত্তি করেন। তিনি বলেন—

غذوتك مولودا و علتك يافعا ❁ تعل بما أسدي إليك و تنهل

إذا ليلة نابتك بالشجو لم أبت ❁ لبلواك إلا ساهرا أتململ

فلما بلغت السن والغاية التي ❁ إليها مدى ما كنت فيك أؤمل

جعلت جزائي غلظة وفظاظة ❁ كأنك أنت المنعم المتفضل

শিশু অবস্থায় তোমাকে আমি অন্ন দান করেছি এবং ভরণপোষণ দিয়ে তোমাকে করেছি বড়। হে সিংহ আমার, এখন তুমি কেন দুর্বল হয়ে পড়লে এবং কীসের দিকে এত ঝুঁকে গেলে?

রাতের বেলা যখন তোমার কোনো সমস্যা দেখা দিত, তখন তোমার এ বিপদের কারণে গোটা রাত আমি অস্থিরচিত্তে নির্ঘুম রাত কাটাতাম!

কিন্তু যখন তোমার বয়স হয় এবং কাঙ্ক্ষিত সীমায় পৌঁছে যাও, তখনো তোমার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলাম না।

অথচ তুমি আমাকে সেই প্রতিদান দিয়েছ এমন কঠোর ও রূঢ় আচরণ করে; যেন আমি নই, এ যাবৎ তুমিই আমার ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করেছ!

৪. সুখ-অর্জনে মেজাজ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব

মানুষের সুখ লাভের মৌলিক ভিত্তি হলো, তার গঠন-প্রকৃতি তথা মেজাজ এবং ব্যক্তিত্ব। এ দুটি উৎস থেকেই সর্বদা ব্যক্তির সন্তোষ কিংবা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তাই তো ব্যক্তির মেজাজ যখন ভারাক্রান্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে, তখন সে এমনসব বিষয়ে ক্লান্তি ও বিরক্তি অনুভব করে, যেসব বিষয়কে নীরব ও শান্ত মেজাজের লোকেরা উপভোগ্য ও পাঠযোগ্য জ্ঞান করে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি এক্ষেত্রে কিছুই অনুভব করে না।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ প্রায়শই আপন ছাত্রদের লক্ষ করে বলতেন—‘*ইলমে দ্বীনের যে স্বাদ ও তৃপ্তিতে আমরা বিভোর হয়ে আছি, রাজা-বাদশাহগণ যদি তা উপলব্ধি করতে পারত, তাহলে তারা এ স্বাদ ছিনিয়ে নিতে তরবারি সঙ্গে নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিত।*’

আসলে এ সকল রাজা-বাদশাহ পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞানভান্ডার তরবারির জোরে যদি হস্তগত করতো, তাহলে তাদের অন্তরের সংকীর্ণতা দূর হতো। কিন্তু তারা এ সমস্ত বইপত্র পড়ে সেই তৃপ্তি পেত না, যা ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর ছাত্ররা নিজ কিতাব পড়ে ও ইলমি আলোচনা করে পেয়ে থাকেন।

৫. সুখ আপনার চিন্তার ফসল

মানুষের সুখ ও দুঃখ এবং তার পেরেশানি ও প্রশান্তি উৎসারিত হয় একমাত্র তার আত্মা থেকেই। এই আত্মাই জীবনকে হয়তো উজ্জ্বল রঙে রাঙিয়ে তোলে কিংবা তার গায়ে লেপ্টে দেয় অনুজ্জ্বল রং। যেরূপ ভিক্ষুক তার ভিক্ষার পাত্রের রঙেই রঙিন হয়ে ওঠে।

জ্বরের তীব্রতায় কুঁজো হয়ে যাওয়া এক দেহাতি ব্যক্তিকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে যান। তাকে সমবেদনা জানাতে এবং তার মধ্যে সাহস সঞ্চার করতে। তিনি লোকটিকে বললেন—ভালো হয়ে যাবে। দেহাতি লোকটি বলল, না, বরং বয়োবৃদ্ধ এক লোকের গায়ে এ জ্বর তো দিনদিন তীব্রতর হচ্ছে, যাতে করে তাকে কবরে নিয়ে যেতে পারে। নবিজি উত্তরে বললেন, তাহলে এমনটিই হবে।[৪]

অর্থাৎ যেকোনো ব্যাপার মানুষের ধারণার অনুগামী হয়। চাইলে এটিকে তুমি ভালো মনে করে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারো। আবার চাইলে এটিকে ক্রোধ ও নিজের ধ্বংসের কারণ বানাতে পার। সুতরাং যে সন্তুষ্ট থাকবে, তার পক্ষে সন্তুষ্টিই আসবে। আর যে ক্ষিপ্ত হবে, ক্রোধই তার ওপর আপতিত হবে।[৫]

আমেরিকার প্রখ্যাত লেখক ডেল কার্নেগি বলেন—

> সুখময় ও প্রীতিকর চিন্তাভাবনা যদি আমাদের মধ্যে জায়গা করে নেয়, তাহলে আমরা হই সুখী ও ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে অপ্রীতিকর ও কুচিন্তা যদি আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাহলেই আমরা অসুখী ও হতভাগ্য। আর অস্বস্তিকর ভাবনা যদি একবার আমাদের পেয়ে বসে, তাহলে আমরা হয়ে যাই ভীতু ও কাপুরুষ। রোগ-শোকের দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরলে তো আমরা অধিকাংশ সময়ই অসুস্থ থাকি। এবং এভাবে চলতেই থাকে।[৬]

৬. সুখ মানে মালিকানাধীন বস্তু উপভোগ করা

সুখ উৎসারিত হয় হৃদয়ের গহিন থেকে এবং চিন্তাভাবনা ও স্বভাব থেকে। জীবনের যাবতীয় বিষয়কে তুমি কোন দৃষ্টিতে দেখবে, সমস্যার মোকাবিলা তুমি কীভাবে করবে এবং এ জীবনে তোমার ভাগ্য নিয়ে তুমি কীভাবে পরিতুষ্ট থাকবে—এ সব বিষয়ের ওপরও সুখ নির্ভর করে।

---

[৪] সহিহুল বুখারি
[৫] সুনানুত তিরমিজি
[৬] সূত্র : শাইখ মুহাম্মাদ গাজালি রচিত জাদ্দিদ হায়াতাক

দুজন লোক একটি বাগানে প্রবেশ করে। গাছের কোনো এক ডালে ফুটন্ত একটি সুন্দর গোলাপ ফুলের ওপর তাদের দৃষ্টি পড়ে। ফুলটি দেখতেই একজন তা ছিঁড়ে আনার ইচ্ছা করে। ছিঁড়তে গিয়ে তার হাতে কাঁটার হুল ফুল ফুটে যায়। তখন সে মনে মনে বলে, জীবনটা কতই-না কঠিন এবং ভীষণ কষ্টের। এত কণ্টকাকীর্ণ যে, ফুটন্ত গোলাপ ফুলটি পর্যন্ত কাঁটা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ফলে আমরা ফুলটি উপভোগ করতে পারছি না। পক্ষান্তরে অপরজন বলে, জীবনের যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল আল্লাহর জন্যই। জীবনটা কতই-না উপভোগ্য ও মনোমুগ্ধকর! এমনকি আকর্ষণীয় এ গোলাপটির মাঝে কাঁটা পর্যন্ত স্থাপন করা হয়েছে।

সুখী লোক বলবে, আমার পানপাত্রটি অর্ধেক ভরা। পক্ষান্তরে অসুখী লোক বলবে, আমার পানপাত্রটি অর্ধেক খালি।

এভাবেই জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

জীবনের প্রতিটি বস্তুরই একটি নান্দনিক চিত্র থাকে। আরেকটি কুৎসিত। কিন্তু দুনিয়ার নান্দনিক চিত্রটিই তুমি গ্রহণ কর। আর তার কুৎসিত চিত্রটির কথা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর।

সুতরাং সুখ মানে হলো, নিজের মালিকানাধীন বস্তু উপভোগ করতে পারা এবং অসুন্দরের পরিবর্তে সৌন্দর্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ও সৌন্দর্যের নানান দিক আবিষ্কার করতে পারা। তো শুধু মালিকানা লাভের নামই সুখ নয়। বরং মালিকানাধীন বস্তুর সর্বোত্তম ব্যবহার করাই হলো প্রকৃত সুখ।

সুতরাং দুর্ভাগ্য ও তার কারণসমূহ থেকে যদি আপনার জীবন মুক্ত ও পবিত্র থাকে, তাহলে আপনি এভাবে বলবেন না যে, আমি অসুখী বা দুর্ভাগা নই। বরং এভাবে বলুন, আমি সুখী ও ভাগ্যবান। এটা বলবেন না যে, আমার জীবনটি অর্ধেক শূন্য। বরং বলুন, আমার জীবন অর্ধেক পরিপূর্ণ।

৭. সুখ তো মিলে কর্মে, ধনদৌলতে নয়

কর্ম সুখ লাভের অন্যতম উপায়। তাই তো ফলপ্রসূ কাজ ব্যক্তিকে অবসরের বিষণ্নতা থেকে মুক্তি দেয় এবং বেকারত্বের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে।

যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে আপন কর্মকে ভালোবাসে, সত্যিই সে কর্মে সুখ লাভ করে। কাজ যদিও কষ্টদায়ক এবং এক প্রকার ক্লান্তিকর, কিন্তু অতিরিক্ত অবসর থাকার দরুন যারা মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়, তাদের সংখ্যা সেসব লোকের চেয়ে অধিক, যারা কষ্টকর কাজ করে মানসিক রোগে ভোগে। সুতরাং অবসর মানসিকভাবেই খারাপ প্রভাব সৃষ্টি করে। তাছাড়া এর মানসিক প্রভাব অর্থনৈতিক প্রভাবের চেয়ে কম নয়।

কর্মের মাধ্যমে মানুষের সুখ-প্রবৃদ্ধি লাভ করে, যদি সে একমাত্র সম্পদ উপার্জনকেই নিজের কর্মের উদ্দেশ্য না বানায়। কিন্তু সম্পদ সঞ্চয়ই যদি তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে যেন নিজেকে দাস-বাজারে বিক্রি করে দিলো এবং কালের আবর্তে সে অর্থের গোলাম বনে গেল। কী পরিমাণ অর্থের মালিক, সে হিসেবে সুখ মানুষের কাছে আসে না। বরং এ অর্থ সে কোন কাজে ব্যয় করবে, সে হিসেবেই সুখের দেখা মিলে।

সুখ লাভের জন্য অর্থসম্পদ অপরিহার্য কোনো বিষয় নয়। উলটো সম্পদ সঞ্চয় করতে অশান্তি ভোগ করতে হয়, খরচ করতে গেলে কষ্ট লাগে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধি করতে গেলে পেরেশানি পোহাতে হয়। অর্থ জীবনের জন্য। আর জীবন সুখ লাভের জন্য। সুতরাং সম্পদ কামাই করতে গিয়ে জীবনের স্বাদ শেষ করে দিয়ো না।

বিশেষজ্ঞদের গবেষণা মতে, মানুষের অশান্তি ও দুর্দশার নেপথ্য কারণ লুকিয়ে আছে অবসর সময়ের মধ্যে। কারণ, এ অবসরই মানুষকে বারংবার এ প্রশ্নের সম্মুখীন করে যে, সে সুখী না অসুখী। তারা আরো বলেছেন, এর চিকিৎসা নিহিত আছে কাজের মধ্যেই। বরং ক্লান্তি আসা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রমই হলো এর ওষুধ। কারণ, ক্লান্তিই সুখ লাভের অন্যতম অনিবার্য শর্ত।

যে লোক শীতকালে কোনো কষ্ট ভোগ করেনি, গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে তার কোনো লাভ নেই। নেই কোনো উপকারও। যেরূপ কিছু প্রাচুর্যশালীদের কাটানো আজীবন ছুটিই তাদের জন্য জাহান্নামের সর্বোত্তম পরিচয় বহন করে!

৮. তুমি তোমার পেশার দাস বনে যেয়ো না

কেউ যেন একথা মনে না করে যে, আপন পেশায় কর্মব্যস্ত থাকার মাঝেই শুধু সুখ শান্তির দেখা মেলে। কেননা, সুখ অর্জনের জন্য এছাড়াও আরও বহু উপায় ও মাধ্যম আছে। এসব মাধ্যম ও উপায় গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় তার দৃষ্টান্ত হবে সেই চির কুমারের মতো, যে জীবনভর আপন পেশার গোলাম হয়ে কাটিয়ে দেয়। মুদি দোকানে কাজ করা ছাড়া জীবনের কোনো কিছুই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ঠেকে না। ভোর সকালে দোকানে চলে আসে। আর অনেক দেরি করে রাতের বেলা নির্জন বাসায় ফিরে বিছানায় চিত হয়ে পড়ে থাকে। অবশেষে ভোরের আলো যখন ফোটে, তখন সে এদিক-সেদিক না তাকিয়েই আগের মতো আবার দোকানে চলে যায়। এভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করার পর যখন মৃত্যু এসে যায়, তখন তার কোনো নিকটাত্মীয় তার কবরের ওপর স্মৃতি ফলক স্থাপন করে তাতে নামের নিচে লিখে দেয়, জন্মেছে মানুষ হয়ে। মৃত্যুবরণ করেছে মুদি দোকানদার হয়ে।

একইভাবে কেউ জন্মগ্রহণ করে মানুষ হয়ে। কিন্তু মারা যায় হয়তো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কিংবা ডাক্তাররূপে অথবা ব্যবসায়ী বেশে অথবা আপনি যা ইচ্ছে বলতে পারেন।

৯. সুখ মানে নিজের চাওয়া-পাওয়া জানা থাকা

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সুখ মানে হলো আপনার জানা থাকা যে, আপনি দুনিয়া থেকে কী চান এবং কী পাওয়ার আশা করেন। অতঃপর সাহস করে নিজের চাওয়া-পাওয়া বুঝে নেন। কারণ, এ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একেবারেই জানে না এবং আপন গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। তারা অনেকটা খেলনার দোকানে আসা ছোট ছোট বাচ্চাদের মতো। দোকানে অনেক অনেক খেলনার বস্তু থাকে। তো বাচ্চারা একটা হাতে নেয়। অতঃপর সেটি ফেলে দিয়ে আরো চাকচিক্যময় ও আকর্ষণীয় খেলনাটি ধরে। এর কিছুক্ষণ পরেই এর চেয়ে আরো আপডেট, আরো উন্নত ও দৃষ্টিনন্দন খেলনাটি হাতে তুলে নেয়। বাচ্চারা এমন করতে করতে একসময় হয়তো সবচেয়ে কম দামি খেলনাটি নিয়ে বের হয় কিংবা খালি হাতে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যায়।

১৯২৮ সালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে ইস্কান্দার ম্যাকারিউস বলেন—পেরেশান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকদের মাঝেই এ চিত্র বেশি দেখা যায়। হাজার আকাঙ্ক্ষা তাদের টানাহেঁচড়া করে এবং সুখের কবুতর ও শত আনন্দ-বিনোদনের সাথে তাদের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি উড়ে যায়। ফলে কখনো তারা গাড়ির মোহে ডুবে থাকে। কখনো তাদের স্বাদ জাগে জুয়ার টেবিল চাপড়াতে কিংবা নিজেদের মনোবাসনা ও কামেচ্ছা পূরণের নেশায় পৃথিবীব্যাপী ঘুরে বেড়াতে। কখনোবা দিনের বেলায় ঘুমে বিভোর থেকে বিনিদ্র রজনি কাটানোর সখও তাদের ঘিরে ধরে।

এ সমস্ত লোক এক কাজ ছেড়ে আরেক কাজের দিকে ছুটতে থাকে। তারা তালাক দিয়ে আরেকটি বিবাহ করে। আবার তালাক দেয়। এভাবে পুরাতন ভালোবাসা তাদেরকে নতুন ভালোবাসার প্রতি ধাবিত করে। ফলে তারা বলে, আরও লাগবে? তাদের ধারণা, এভাবে ইচ্ছেমতো ঘুর ঘুর করার মাঝেই বুঝি মনের স্বাদ ও সুখ বিদ্যমান। কিন্তু অস্থিরমতির এ অস্থরতায় এবং নিয়ন্ত্রণহীন মনোবাসনায় সুখের গন্ধও পাওয়া যায় না। তারা পরিতৃপ্ত ও সুখী হয় না। কেননা, তাদের জানা নেই, তারা কী চায় এবং যা চায়, তাতে শান্তিরও দেখা মেলে না।

আসলে, সুখ লাভের রহস্য হলো, প্রথমেই আপনাকে জানতে হবে, আপনি কী চান। অতঃপর সেই চাওয়াকে পাওয়ার জন্য আপনাকে তৎপর হতে হবে এবং সুখী হওয়ার ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী হতে হবে। সুতরাং দুনিয়ার বিপদাপদকে নিজের ওপর চাপতে দেবেন না এবং নিজের অশ্রুজলে ভেসে যাবেন না। বরং সফল ও বিজয়ীর বেশে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।[৭]

---

[৭] সূত্র: আল-উরুসাহ, ৯/১২/১৯২৮ ইস্কান্দারিয়া ম্যাকারিউস

গ্রিক দার্শনিক আবিকোর উৎসবের দিনগুলোতে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে সামান্য পরিমাণ পনির দিয়ে শুধু শুকনো রুটি খেয়ে সুখী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বাহ্যত মনে হয়েছে, এ পন্থায় তিনি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, এ পন্থা সকলকেই সফলতা এনে দেবে।

কিছু মানুষ আছে, সুখের বস্তুগত যাবতীয় উপাদান সুস্থতা, অর্থকড়ি ও সন্তানসন্ততি অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্য তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। এর কারণ হলো, তারা জানে না, কীভাবে জীবনযাপন করতে হবে এবং সুখময় জীবন সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে কুরআনের নীতিমালাকে পথনির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করেনি।

১০. সুস্থতার ক্ষেত্রে সুখ

সুস্থতা সুখের সর্বোন্নত প্রকার। প্রাচুর্য, মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নাম সুখ নয়। বরং সবকিছুর আগে স্থান হলো সুস্থতার। পূর্ণাঙ্গ সুস্থতা যার মধ্যে পর্যাপ্ত থাকবে, সেই সকল মুসিবত তার সামনে হীন ও তুচ্ছ হয়ে পড়বে।

বর্ণিত আছে, এক দরবেশ বাইতুল্লাহর হজ করতে সফর করেন। তো তার জুতো ক্ষয় হয়ে যায়। ফলে মরুভূমির তীব্র তাপে তার দুটো পা পুড়ে যায়। এ অবস্থাতেই দরবেশ তার সফর শেষ করেন। এ দুরবস্থা ও দুর্ভাগ্যের কারণে তার ভীষণ রাগ হয়। কারণ, এ দুর্ভাগ্যের কারণেই তো আজ তিনি সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। সম্পদ থাকলে তো তিনিও এমন কোনো বাহনে চড়তে পারতেন, যার ফলে এই উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর সফর করার কষ্ট লাঘব হতো। অবশেষে তিনি যখন মক্কায় পৌঁছলেন, সেখানকার কোনো এক গেইটে এক অসুস্থ ভিক্ষুককে দেখতে পান। যার পা নেই। সঙ্গে সঙ্গে দরবেশ লোকটি কেঁদে ফেলেন এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, এ দুই পা নিয়ে সেই অসুস্থ ও বঞ্চিত লোকটির চেয়ে তিনি অনেক সুখে আছেন।

কিন্তু কিছু মানুষ তো এমনও আছে, যারা পরিপূর্ণ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও অসন্তুষ্ট থাকে এবং বিরক্তি বোধ করে। তাদের এ অবস্থাটাই বিশেষভাবে অসুস্থ ও দরিদ্রদের কাছে বড় বিস্ময়কর ঠেকে। বর্নার্ড শ'র বক্তব্যে যেন তাদের বিস্ময়ই ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন—'যে দাঁতের ব্যথায় আক্রান্ত, সে দাঁত ব্যথা নেই এমন সকলকেই বড় সুখী ভাবে।'

এই ধারণা যে সম্পূর্ণ অবান্তর, তার কারণ হলো, পূর্ণ সুস্থতা ও পর্যাপ্ত অর্থকড়ি—কোনোটাই সুখের চাবিকাঠি নয়। বরং সুখী হওয়ার জন্য এ দুটো অনিবার্য শর্ত। অন্যভাবে বললে, এ দুটো সত্তাগতভাবে মৌলিক কোনো সুখ দিতে পারে না। তবে

এগুলোর অভাব থাকলে সুখও পাওয়া যায় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুমিনের সর্বোচ্চ আশা হবে ইহকালে সুস্থ থাকা আর পরকালে ক্ষমা লাভ করা।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إليك انتهت الأماني يا صاحب العافية

সকল আশা তোমার পূরণ হবেই হে সুস্থতার নিয়ামত ভোগকারী।[৮]

তিনি আরো বলেন—

سلو الله العفو و العافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية

তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও সুস্থতা চাও। কেননা, ঈমানের পরে সুস্থতার চাইতে শ্রেষ্ঠ কোনো নিয়ামত কাউকে দেয়া হয়নি।[৯]

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন— কঠিন বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তিটিই সবচেয়ে বেশি দুআর মুখাপেক্ষী নয়। বরং তার চেয়েও দুআর অধিক মুখাপেক্ষী সেই লোক, যে সুস্থ থেকে বিপদাপদ থেকে নিরাপদ নয়।

ইবনুর রুমি বলেন—

إذا ما كساك الدهر سربال الصحة ❁ و لم تخل من قوت يحل و يقرب

فلا تغبطن أهل الكثير فإنما ❁ على قدر ما يعطيهم الدهر يسلب

যুগ যদি তোমাকে সুস্থতার পোশাকে না জড়ায়

এবং তুমি আসন্ন খাবার-দাবারের ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত না থাক

তাহলে প্রাচুর্যশালীদের নিয়ে হিংসে করো না।

কেননা, যুগ তাদের যে পরিমাণ দেয়, সে অনুপাতেই

তাদের থেকে ছিনিয়েও নেয়।

[৮] সূত্র: হাদিসটি ইমাম তাবারানি বর্ণনা করেন। হাইসামি রহ. বলেন, হাদিসটির সনদ হাসান।
[৯] সূত্র: হাদিসটি ইমাম তিরমিজি ও ইমাম আহমাদ রহ. বর্ণনা করেছেন। দেখুন, সহিহুল জামিউস সগির, হাদিস নং: ৩৬৩২

১১. নিজেকে শিক্ষিত করে তুলুন, সুখী হতে পারবেন

আমেরিকার গালুপ সংস্থার পরিসংখ্যান বলছে, শতকরা ৫০ ভাগ আমেরিকান নাগরিক বিদ্যালয় কিংবা ভার্সিটিতে তাদের শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার পর একটি গ্রন্থও পড়েনি।

ওয়াশিংটন পোস্ট বলছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় যতগুলো লাইব্রেরি ছিল, সেই সংখ্যাটা ১৯৯৬ সালে এসে একটুও বৃদ্ধি পায়নি। পত্রিকাটি একাধিকবার এ অভিযোগও তুলে ধরে যে, আমেরিকার সরকারি বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান এতটাই করুণ যে, বিশ্ববিদ্যালগুলোতে ভর্তি হওয়া নতুন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অর্ধেক ছাত্রছাত্রীই কোনো রাষ্ট্রের নামবিহীন বিশ্বমানচিত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারেনি।[১০]

পৃথিবীর সবচেয়ে সুপার পাওয়ার রাষ্ট্রের শিক্ষার যখন এই বেহাল দশা, তখন পড়ালেখার ব্যাপারে আমাদের আরব যুবকদের অনীহা ও বইপত্র উপেক্ষা করার প্রবণতার কথা আর কীইবা বলার থাকে। ইকরা দিয়ে যেই উম্মাহর পথচলা শুরু, সেই উম্মাহ আজ এমন হয়ে পড়েছে যে, তাদের অতি অল্পসংখ্যক লোকই পড়াশোনা করে। মুতানাব্বির নিম্নোক্ত কবিতায় যেন কেউ তার হারানো বস্তু ফিরে পেয়েছে—

تحلو الحياة لجاهل أو غافل ❋ فيما مضى منها و ما يتوقع

و لمن يغالط في الحقائق نفسه ❋ ويسومها طلب المحال فتطمع

প্রখ্যাত কবি মুতানাব্বির ভাষ্যমতে—

> অজ্ঞতা ও মূর্খতার মানেই যখন জীবনের স্বাদ
> তাহলে তো সেই হিসেবে যুক্তি বলে,
> সাধারণত জ্ঞানবিদ্যা ও শিক্ষার মানেই হলো জীবনের তিক্ততা।

অপর এক কবি বলেছেন—

ما أحسن العيش لو أن الفتى حجر ❋ تنبو الحوادث عنه و هو ملموم

> ইশ, মানুষ যদি এমন অনুভূতিশূন্য পাথর হতো যেখানে বিপদাপদের ঠাঁই হয় না, তাহলে তো জীবনটা বড়ই মধুর হতো!

তো এ কবির মতে, মধুর জীবনের জন্য শুধু অজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়। বরং অনুভূতিহীন হওয়াটাও অপরিহার্য। কারণ, পাথরের তো কোনো অনুভূতি নেই, নেই তার কোনো জীবনও!

---

[১০] সূত্র: উস্তাদ হুসাইন আহমাদ আমিন রচিত কিমিয়াউস সাআদাহ। *ইকরা ম্যাগাজিন*, ১৯৯৮

ড. আহমাদ জাকি বলেন—আমরা যদি এ গতিতেই আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাই, তাহলে তো দেখা যাবে, মানুষের চেয়ে পশুরাই অধিক সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী।

অশিক্ষিত লোকের আকল আছে। কিন্তু সেটির কার্যক্ষমতা কম এবং অতটা গতিশীলও নয়। বিপরীতে শিক্ষিত লোকেরও আকল-বুদ্ধি থাকে। কিন্তু তার আকল-বুদ্ধির কার্যক্ষমতাও অধিক। আবার চলেও বেশি। যেমনিভাবে মানবদেহের স্বাদ নিহিত আছে নড়াচড়া করার মধ্যে, স্থির হয়ে বসে থাকার মধ্যে নয়। তেমনি আকল ও বিবেকের স্বাদও নিহিত আছে বিবেককে কাজে লাগানোর মধ্যে।

জাহেল ও নির্বোধ লোক শুধু সংবাদপত্র পড়েই ক্ষান্ত থাকে। গভীর ও অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে নয়; বরং ভাসাভাসা দৃষ্টিতে পড়ে যায়। পত্রিকার এমনসব সাধারণ ও হালকা বিষয় সে বেছে নেয়, যেগুলো গলাধঃকরণ করলে তার বদহজম হবে না।

পক্ষান্তরে, শিক্ষিত লোক তো পড়ে বইপত্র। পাঠকালে সেখানে সে হাতড়ে বেড়ায় মানব-বিবেকের ফসল এবং শতসহস্র বছর যাবৎ প্রজন্ম পরম্পরায় রেখে যাওয়া আদম সন্তানের জ্ঞানভান্ডারের মিরাস। অধ্যয়ন করে করে এ সমস্ত কিছু সে নিজের বিবেকের থলেতে সঞ্চয় করে রাখে। বুদ্ধির ঝুলিতে করে রাখে সংরক্ষিত। তাই সে যখন কোনো কিছুর দিকে তাকায় কিংবা কোনো ব্যাপারে হুকুম আরোপ করে, তখন সে শুধুই নিজের চোখে দেখে না এবং হুকুম আরোপ করে না। বরং অতীত ও বর্তমানের যাদের বইপত্র সে পড়েছে, এমন হাজারো মানুষের চোখে তাকে সবকিছু দেখতে হয় এবং হুকুম আরোপ করতে হয়।

পরিপূর্ণ শিক্ষিত ব্যক্তি, যার সর্বাঙ্গেই শিক্ষার ছোঁয়া লেগে আছে; অনুভূতি শক্তিতেও, বিবেকবুদ্ধিতে এবং হৃদয় জগতেও, এমন আপাদমস্তক শিক্ষিত লোকই এ পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। সে খেয়েদেয়েও সুখী। অনাহারেও সুখী। পোশাক থাকলেও সুখী। পোশাক না হলেও সুখী। যতদিন তার বিবেকের কিরণ অবশিষ্ট থাকবে, থাকবে তার উষ্ণ হৃদয় ও উন্মুক্ত অন্তর্দৃষ্টি, ততদিনই সে রবে সুখী ও ভাগ্যবান।[১১]

কিছু মানুষের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ আছে যে, সে বইপত্র, কলম-কালিও কাগজের মধ্যেই আপন সুখ অনুভব করবে। তাই তো আমরা এমন বহু আলিম ও সাহিত্যিক দেখতে পাই, যারা বইয়ের পাতায় পাতায় বুঁদ হয়ে থাকা, এর ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা জ্ঞানভান্ডার আবিষ্কার করা এবং প্রকৃতি ও গবেষণাগারে সুপ্ত পৃথিবীর রহস্য নিয়ে সমানভাবে গবেষণা করা ছাড়া জীবনের কোনো স্বাদ উপলব্ধি করেন না।

---

[১১] সূত্র: ১৯৫৪ সালে আল-হিলাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ড. আহমাদ জাকির প্রবন্ধ সাক্বিফ নাফসাকা, তাইশ সাঈদান

১২. সুখ লাভের জন্য বস্তুগত দিকটিও কি অপরিহার্য?

নিঃসন্দেহে সুখ লাভের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তুরও প্রয়োজন আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—চারটি বস্তু সুখের প্রধানতম অংশ। ১. নেককার স্ত্রী ২. প্রশস্ত বাসস্থান ৩. সৎ প্রতিবেশী ৪. আরামদায়ক বাহন। আর চারটি বস্তু অসুখ ও দুঃখের অন্যতম কারণ। ১. খারাপ স্ত্রী ২. অসৎ প্রতিবেশী ৩. খারাপ বাহন ৪. সংকীর্ণ বাসস্থান।[১২]

সুতরাং অন্তর বিনষ্টকারী বস্তু তথা খারাপ স্ত্রী, মন্দ বাসস্থান ও খারাপ বাহন থেকে নিরাপদ থাকা এবং কোনো কষ্ট-ক্লেশ ব্যতীত খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া—এটুকু হলেই মানুষের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী কতই-না চমৎকার। তিনি ইরশাদ করেন—তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন ঘরে নিরাপদে থাকে, শারীরিকভাবে থাকে সুস্থ, আর তার কাছে থাকে একদিনের খাবারের ব্যবস্থা, তাকে যেন গোটা দুনিয়াই দিয়ে দেওয়া হলো।[১৩]

১৩. সর্বক্ষেত্রে অল্পে তুষ্টিতেই সুখ

সুখ লাভের উপায় কী? এ নিয়ে প্রসিদ্ধ মুসলিম ডাক্তার সাবেত ইবনু কাররা গবেষণা করেন। তার এ গবেষণা তিনি অত্যন্ত অল্প কথায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন—দেহের প্রশান্তি বিদ্যমান আহারের স্বল্পতায়। আত্মার প্রশান্তি নিহিত আছে গোনাহের স্বল্পতায়। হৃদয়ের প্রশান্তি পাওয়া যায় অল্প পেরেশানির মাঝে। জিহ্বার প্রশান্তি মিলে কম কথা বলার মাঝে।

শাইখ আহমাদ আশ শিরবাসি বলেন, বিদ্বান, দার্শনিক ও ডাক্তার যথার্থই বলেছেন—**দেহের প্রশান্তি বিদ্যমান আহারের স্বল্পতায়;** কেননা, মানবদেহ একটি মেশিন। এ মেশিনের জ্বালানি হলো খাদ্য। আর এটি স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, জ্বালানি দিতে হয় পরিমাণমতো। জ্বালানির পরিমাণ যদি বেশি হয়ে যায়, তাহলে সেটি আগুনের চেয়েও মারাত্মক রূপ ধারণ করে। তদ্রূপ মানবদেহকে যদি তার চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিই, তাহলে এ দেহ ব্যক্তির জন্য এমন বিপদ ডেকে আনবে যে, তাকে মনুষ্যত্বের গণ্ডি থেকে টেনে এনে পশুত্বের কাতারে নিয়ে যাবে। কখনো কখনো তা তার মৃত্যু ও ধ্বংসকেও ত্বরান্বিত করতে পারে।

জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানরা তো খায় বেঁচে থাকার জন্য। আর মূর্খ ও নির্বোধরা বেঁচেই থাকে খাওয়ার জন্য।

---

[১২] সূত্র: ইমাম হাকেম এবং বাইহাকি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন, সহিহুল জামিউস্ সগির: ৮৮৭

[১৩] সূত্র: ইমাম তিরমিজি এবং ইবনে মাজাহ হাদিসটি বর্ণনা করেন। দেখুন, সহিহুল জামিউস্ সগির: ৬০৪২

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

كلوا و اشربوا و لا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين

তোমরা খাও এবং পান করো। অপচয় করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না। [সুরা আরাফ, আয়াত : ৩১]

কথায় আছে, আমরা এমন জাতি যে, ক্ষুধার্ত না হলে খাই না। কিন্তু যখন আহার করি, তখন আবার পেট ভরে খাই না।

নফসের প্রশান্তি নিহিত আছে গোনাহের স্বল্পতায়। কারণ, নফস অধিক পরিমাণে কুকর্মের আদেশ করে। তাই সে যখন তার নিয়ন্ত্রণ থেকে ছাড় পেয়ে যায় এবং বাঁধন থেকে ছুটে যায়, তখন সে শয়তানের সাথে একই পথে বিচরণ করে বেড়ায়। ফলে সে আত্মসাৎ করে। ধর্ষণ করে। ধোঁকা ও প্রতারণা করে। জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করে।

এ কারণেই মানুষের সর্বাধিক ঘোরতর শত্রু হলো, তার নফসের প্রবৃত্তি। মানুষ যদি নফসের প্রবৃত্তির আহ্বানে সাড়া দেয়, তাহলে নফস তাকে শেষ করে দেবে। আর যদি সে তার নফস ও প্রবৃত্তির মাঝে আড় সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে সরল পথে অবিচল ও অটল থাকতে পারবে।

কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

و نفس و ما سوىها فألهمها فجورها و تقوىها قد أفلح من زكىها و قد خاب من دسىها .

শপথ আত্মার এবং যিনি তাকে যথাযথ করেছেন তাঁর। তার পর তাতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তার অসৎকর্মের ও সৎকর্মের। অবশ্যই সে সফল হয়েছে, যে আত্মাকে করেছে পবিত্র। আর বিফল হয়েছে সে, যে তাকে করেছে কলুষিত। [সুরা শামস, আয়াত : ৭-১০]

বুসিরির ভাষায়—

و النفس كالطفل إن تهمله شب

على حب الرضاع و إن تفطمه ينفطم

আত্মা হলো শিশুর মতো। তাকে সুযোগ দিলে সে দুগ্ধপানে প্রচণ্ড আগ্রহী হয়ে উঠবে। আর দুধ ছাড়িয়ে নিলে, সেও দুধ ছেড়ে দেবে।

অন্তরের প্রশান্তি পাওয়া যায় চিন্তা-পেরেশানি ও ভয় কম করার মধ্যে : কারণ, দুর্বল চিত্ত ও ভীতু হৃদয় ব্যক্তির সামনে সর্বদা দুর্বলতা ও পেরেশানির রাস্তা খুলে দেয়। ফলে সে স্থায়ী টেনশন ও চিন্তায় দিনাতিপাত করে। সুতরাং অতীতকে নিয়ে সে লজ্জিত থাকে। আর বর্তমানের কারণে সে সংকোচ বোধ করে। ন্যায়-অন্যায়ের দরুন তার কিছু শত্রুও জন্ম নেয়। ফলে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হলে তাকে হিসেব কষতে হয় হাজারবার। এমন বস্তুর আশা করে, যা পাওয়া যায় না এবং এমন কিছুর স্বপ্ন দেখে, যা শুধু কল্পনাই করা যায়।

আর যে ব্যক্তির অন্তর দৃঢ় ও অবিচল থাকে, সে তো আল্লাহর ফয়সালাকেই বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করে আল্লাহর রাসুলের নিম্নোক্ত অমর বাণীও। তিনি বলেন— মুমিনের সব ব্যাপারই বড় বিস্ময়কর। তার সবকিছুই কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক। এটি শুধু মুমিনের জন্যই। অন্য কারোর জন্য নয়। সুখ ও আনন্দের কোনো বিষয় দেখা দিলে মুমিন কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করে। সুতরাং সুখ ও আনন্দের ব্যাপারটি তার জন্য কল্যাণকরই হলো। আর বিপদাপদ ও দুর্দশায় আক্রান্ত হলে সে ধৈর্যধারণ করে। এভাবেই দুর্দশা ও বিপদাপদও তার জন্য মঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১৪]

অন্তরের প্রশান্তি এমনই এক নিয়ামত, যা কেবল সেই ব্যক্তিই লাভ করতে পারে, যার অন্তর সদা আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর সুদৃঢ় ও অটল থাকে। এ কারণেই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দুআটি বেশি বেশি করে করতেন—

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

হে অন্তর পরিবর্তনের মালিক, আপনি আমার অন্তরটাকে আপনার দ্বীনের ওপর অবিচল রাখুন।[১৫]

হৃদয় যখন আপন বিশ্বাসে অটল থাকবে, আপন রবের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তাঁর আশ্রয়ে আশ্রয় নেবে, তখন তো সে সুদৃঢ় ও মজবুত খুঁটিতেই আশ্রয় নিল। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে মনের নিরাপত্তা, হৃদয়ের প্রশান্তি ও স্থিরচিত্ততার পন্থা বাতলে দিয়েছে। মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন বলেছে—

الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب

১৪ হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন।
১৫ হাদিসটি ইমাম আহমাদ ও তিরমিজি রহ. বর্ণনা করেন।

যারা ইমান আনে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। শুনে রেখো, আল্লাহর জিকিরেই কেবল সকল অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। [সুরা রাদ, আয়াত : ২৮]

অনুরূপভাবে ইসলাম মুসলিমদেরকে চিন্তা-পেরেশানি এবং তার কারণসমূহ থেকেও দূরত্ব বজায় রেখে চলার নির্দেশ প্রদান করে। তাই তো কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

ولا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين

তোমরা ভেঙে পড়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩৯]

কুরআন অবিচল বান্দাদের গুণ বর্ণনা করেছে এই বলে যে, অবিচল বান্দাগণ ভয় পায় না এবং চিন্তিতও হয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا و أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة و لكم فيها ما تشتهي أنفسكم و لكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

যারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক, অতঃপর অবিচল থাকে, তার ওপর ফেরেশতাগণ এ বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হয় যে, তোমরা ভয় পেয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। বরং তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হতো। আমিই তোমাদের বন্ধু; দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালে। এখানে তোমাদের জন্য তা-ই থাকবে, যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেটাও থাকবে, যা তোমরা দাবি করবে। এসব কিছু পরম ক্ষমাশীল ও দয়াময় সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারিস্বরূপ থাকবে। [সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৩০-৩২]

জবানের প্রশান্তি কম কথা বলার মাঝেই : এর কারণ, অধিক কথা বলার দরুন পদস্খলন হয়। মানুষের জিহ্বা যখন নিয়ন্ত্রণহীন কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন এ জিহ্বা মানুষের জন্য বড় বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসিয়ত করে বলে দিয়েছেন—তুমি তোমার জিহ্বাকে নিজের কাছে আটকে রাখো।[১৬]

[১৬] সূত্র: ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেন

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের জিহ্বাকে টেনে ধরতেন এবং তাকে লক্ষ করে বলতেন, এই বেটা, ভালো কথা বলবি। তাহলেই সফলতা লাভ করবি। আর মন্দ কথার ব্যাপারে নীরবতা পালন করবি। তাহলেই নিরাপদ থাকতে পারবি। এর অন্যথা হলে শুনে রেখ, তোকে লজ্জায় মরতে হবে।

এক দার্শনিককে জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষ কখন শক্তিশালী হয়? তিনি উত্তরে বললেন, যখন তার জিহ্বা নিয়ত করে যে, সে শুধু জ্ঞানগর্ভ কথাই বলবে, তখন এ জিহ্বা তাকে শক্তিমান ও ক্ষমতাশালী করে দেয়।

শাইখ আহমাদ আশ-শিরবাসি বলেন, দ্বীনের আলোকে সুখ ও সৌভাগ্য লাভের পন্থা এটিই। সুতরাং দেহ যখন খাবার অপচয় থেকে বেঁচে থাকবে, আত্মা যখন গোনাহের বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে, অন্তর যখন চিন্তা ও পেরেশানির বোঝা থেকে নিজেকে রক্ষা করবে, জিহ্বা যখন অনর্থক কথাবার্তা থেকে হেফাজত থাকবে, তখন ব্যক্তি সরল পথের ওপর অটল-অবিচল থাকতে পারবে এবং সুখী মানুষের কাতারে সে-ও শামিল হয়ে যাবে।[১৭]

১৪. সুখ মধ্যপন্থা অবলম্বনে

যে লোক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করে নিজের চলার জন্য মধ্যপন্থার একটি পরিকল্পনা সাজায়, সেই মূলত সুখী ও সৌভাগ্যবান। সুতরাং যেকোনো ব্যাপারে সুখ পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হলো, সেই ব্যাপারে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়িতে না গিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

পানাহারে মধ্যপন্থা গ্রহণ করলে মানব স্বাস্থ্য রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকে। আনন্দ-বিনোদন ও খেলাধুলায় মধ্যপন্থা মনকে করে প্রফুল্ল এবং শরীরে আনে সতেজ উদ্যম। সম্পদ উপার্জন এবং তা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থার নীতি কামাইয়ের নানাবিধ উপকারিতার পথ প্রদর্শন করে। পড়াশোনা ও অধ্যয়নে মধ্যপন্থা আত্মাকে প্রশান্ত করে এবং মন থেকে বিরক্তি ও ক্লান্তি তাড়িয়ে দেয়। দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ গ্রহণ করে সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থার নীতি অনুসরণ করলে উভয় জীবনেরই সুখ লাভ হয়।[১৮]

[১৭] সূত্র: হায়াতুকা, ৬ষ্ঠ কিস্তি, শাইখ আহমাদ আশ-শিরবাসি
[১৮] সূত্র: শাইখ মুস্তফা আল-গালাইনি রচিত ইজাতুন্ নাশিঈন

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুখের উৎস ঈমান

সুখ বিপুল অর্থকড়ি, বড় বড় পদমর্যাদা ও অধিক সন্তান-সন্ততির মধ্যে নয়। কোনো উপকার লাভ এবং বস্তুগত বিদ্যা অর্জনের মাঝেও সুখ নেই।

সুখ তো একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়, যা চোখ দিয়ে অবলোকন করা যায় না; কোনো পরিমাপক দ্বারা পরিমাপ করা যায় না; কোনো ধনভান্ডারেও তা থাকে না এবং ডলার কিংবা স্বর্ণমুদ্রা দিয়েও তা ক্রয় করা যায় না।

সুখ তো এমনই এক বস্তু, যা মানুষ নিজের অভ্যন্তর তথা আত্মার পরিচ্ছন্নতায়, চিত্তের প্রশান্তিতে, অন্তরের প্রফুল্লতায় ও হৃদয়ের শান্তিতে অনুভব করে।

সুখ এমনই এক বিষয়, যা উৎসারিত হয় মানুষের ভেতর থেকে। বাহির থেকে তা আমদানি করা যায় না। সুখ যদি হয় একটি বৃক্ষ, তাহলে এর জন্মস্থান হলো মানবাত্মা ও মানবহৃদয়। আর আল্লাহর ওপর ঈমান এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস হলো এ বৃক্ষের পানি-খাদ্য-আলো-বাতাস।[১৯]

মিশরের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মুস্তফা লুতফি মানফালুতি বলেন—পৃথিবীতে সুখ পেতে হলে তোমার জন্য একটি পরিচ্ছন্ন অন্তর, প্রশান্ত আত্মা ও পবিত্র হৃদয়ই যথেষ্ট।

কবির ভাষায়—

ولست أرى السعادة جمع مال

ولكن التقي هو السعيد

---

[১৯] সূত্র: ড. ইউসুফ কারজাবি রচিত আল-ঈমান ওয়াল হায়াত

সম্পদ সঞ্চয় করাকে আমি সুখ মনে করি না। বরং সুখী তো সেই, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ ভীতি।

বর্ণিত আছে, স্বামী আপন স্ত্রীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ধমকের সুরে তাকে বলল, তোকে আমি অসুখী ও হতভাগ্য করে ছাড়ব।

স্ত্রী শান্ত কণ্ঠে বলল, আপনি আমাকে অসুখী করতে পারবেন না। যেমন আমাকে সুখীও করতে পারেন না।

স্বামী রাগতস্বরে বলল, কেন আমি পারবো না?

স্ত্রী দৃঢ়তার সাথে বলল, সুখ যদি বেতন-ভাতার মধ্যে থাকতো, তাহলে হয়তো আপনি তা বন্ধ করে দিতেন কিংবা যদি স্বর্ণালংকার ও দামি দামি পোশাকে থাকতো, তাহলে আপনি আমাকে তার থেকে বঞ্চিত রাখতেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, সুখ এমন এক বস্তুর মধ্যে থাকে, যার মালিক না আপনি আর না সকল মানুষ।

এবার স্বামী অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে বসলো, কী সেটা?

স্ত্রী দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলে, আমি তো আমার ঈমানেই সুখানুভূতি লাভ করি। আমার ঈমান থাকে আমার অন্তরে। আর আমার অন্তরের ওপর আমার রব ছাড়া অন্য কারো ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ চলে না।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করতেন এই বলে, হে আল্লাহ, আমাকে অক্ষম লোকদের ঈমানের মতো মজবুত ঈমান দান কর। তিনি আলিমদের ঈমানের মতো ঈমান চাননি। কারণ, অক্ষম লোকদের ঈমান হয়ে থাকে গভীর স্থির ও প্রশান্ত। কোনো ধারণা কিংবা সংশয় তার কাছে ভিড়তে পারে না। আর এই ঈমানটি হলো সহজ ও স্বাভাবিক ঈমান। তারা ভালো করেই বুঝে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ, আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি যাবতীয় বিষয়ের পরিচালক, যে তাঁকে ভালোবাসে, তাকে তিনি কল্যাণ দান করেন, আর যে তার ওপর ঈমান আনে না, তার প্রতি তিনি প্রতিশোধ নেন। হয়তো নগদ অথবা বিলম্বে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস রাখে না যে, আল্লাহই তার আশ্রয়স্থল, তিনিই তার ভরসার স্তম্ভ এবং সকল বিপদাপদে তার সাহায্যকারী, সে ব্যক্তি ফাউন্ডেশনবিহীন ভবনের মতো এবং খুঁটিবিহীন ঘরের সমতুল্য।

তাই তো আমরা লক্ষ করি, যে যত বড় নাস্তিক, তার জীবনটিও তত বেশি অসুখী। তারা তো অঢেল সম্পদের মালিক এবং বিপুল অর্থ রোজগার করে। কিন্তু তাদের ওপর কোনো বিপদ আপতিত হলে, অস্থিরতা ভয় ও আতঙ্ক তাদের ঘিরে ধরতে সময় লাগে না। কারণ, হারিয়ে যাওয়ার ভয়—এটি মনের স্বভাব। পক্ষান্তরে মুমিন, সে সর্বাবস্থায়

আল্লাহর প্রশংসা করে। সুখেও, দুখেও। সে যাই করুক এবং যত বিপদই তার ওপর আসুক, সর্বদা সে ভরসা রাখে এক সুদৃঢ় খুঁটির ওপর। সুরক্ষিত আশ্রয়স্থলের ওপর। দুনিয়াতে কোনো কল্যাণ হারিয়ে ফেললে পরকালে তা পাওয়ার আশা করে। পরিস্থিতি আজকে তার অনুকূলে না থাকলে আগামীকাল আল্লাহর দরবারে আশা রাখে।

ড. আহমাদ আমিনের ভাষ্যমতে, জীবনকে ঘিরে আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এই তথ্যই দেয় যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা সুখ ও সৌভাগ্যের অন্যতম সুমিষ্ট একটি ঝরনাধারা। দ্বীন মানবাত্মায় শক্তি জোগায় এবং তাকে শান্তি ও প্রবোধ দেয়। এই দ্বীন যদি না থাকতো, তাহলে সুখের কোনো অস্তিত্বই থাকতো না এবং থাকতো না জীবনের কোনো মূল্যও। বরং আমরা দেখছি, আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের চেয়ে অধিক সুখী ছিলেন তাদের দৃঢ় ঈমানের কারণে। আর আমাদের যুবক ছেলেরা তাদের চেয়েও অধিক অসুখী ও দুর্ভাগা তাদের সংশয়ের কারণে কিংবা অন্ততপক্ষে ধর্মের প্রতি তাদের অনুরাগ না থাকার কারণে। পাঠক, ইচ্ছে হলে দুটি পরিবারের মাঝে তুলনা করুন। একটি পরিবারে জীবনের ভিত্তি দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা নিজেদের জীবনে দ্বীনকে অবধারিত করে নিয়েছে। আরেকটি পরিবার দ্বীনকে উপেক্ষা করেছে, তার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করেনি। এমন দুটি পরিবার নিয়ে যাচাই করুন। এর পর আমাকে বলুন, দুই পরিবারের কোন পরিবারটি অধিক সুখী?

ড. আহমাদ আমিনের কথামতো আমিও বিশ্বাস করি, পরিবারগুলোর অসুখী হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ, সেখানে এমনসব ছেলেমেয়ের উপস্থিতি, যারা নিজেদের চালচলনে আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও আদেশ-নিষেধের প্রতি খেয়াল করে না। তারা খেয়াল করে নিজেদের প্রবৃত্তি ও মনোবাসনার। তারা মাথায় চুল সংযোজন করে এবং তাদের সকল কামনা চরিতার্থ করে। এক্ষেত্রে তারা কোনো ধর্মীয় বাধার তোয়াক্কা করে না এবং ক্ষতিকর পরিণতির কথাও চিন্তা করে না।

সুতরাং কোনো পরিবারে যখন দ্বীন ইসলাম ছেয়ে যায়, তখন সেই পরিবারের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। বিশেষত দ্বীন পালন যদি হয়, বিদআত কুসংস্কার ও বানোয়াট বিষয়াদি মুক্ত থেকে।[২০]

ড. কামেল ইয়াকুব বলেন—একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি আমার জীবনে যেই বাস্তবতা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছি, তা হলো, সবচেয়ে প্রশান্তচিত্ত ও সুখী মানুষটি সেই, যার ঈমান সবচেয়ে বেশি মজবুত এবং দ্বীনের সাথে যার সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি।

সুতরাং ঈমানই হলো মানুষের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র। জীবনে কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে কিংবা নিবিড় আঁধার ঘিরে ধরলে এখানেই সে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাবে। ঈমান

---

[২০] সূত্র: আল-হিলাল ম্যাগাজিন, জানুয়ারি, সংখ্যা। বর্ষ: ১৯৫৪।

ছাড়া তার কাছে নিজেকে মনে হবে, জীবনের অজানা গলিপথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো অচিন কোনো মানুষ। তার জানা নেই নিজের কোনো লক্ষ্য। না জানা আছে জীবনের কোনো ঠিকানা বা কোনো সুখ।

একবার একটি ঘটনা ঘটে। এক তরুণ ডাক্তার তার শিক্ষকের সাথে এক মেডিকেল কলেজে রোগী দেখতে যাচ্ছিল। শিক্ষকের বাড়ি ছিল আয়ারল্যান্ডে। প্রচুর জ্ঞান রাখতেন তিনি। বয়সে ছিলেন অনেক প্রবীণ। তরুণ ডাক্তার যখনই এমন কোনো রোগীর কাছে যেতো, যার রোগ দূর হয়ে গেছে, তখনই সে রোগীর খাটের টিকেটে লিখে দিত: 'সে আরোগ্য লাভ করেছে। এখন হাসপাতাল ছেড়ে যেতে পারে।' এ সময় শিক্ষক তার ছাত্রের চেহারায় অহংবোধের আলামত লক্ষ করলেন। তাই তিনি ছাত্রকে লক্ষ করে বললেন, বেটা, 'আরোগ্য লাভ করেছে' কথাটি মুছে লেখো, 'ভালো হয়ে গেছে'। কারণ, রোগীকে আরোগ্য দান করবার ক্ষমতা আমরা রাখি না। আমাদের গর্বের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, রোগীরা আমাদের হাতে ভালো হয়। আর আরোগ্য দান—সেটি তো এক আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়।

ড. কামেল ইয়াকুব এ ঘটনা শেষে এই বলে মন্তব্য করেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, গভীর জ্ঞানের পাশাপাশি আল্লাহর প্রতি এরূপ অগাধ বিশ্বাস ও ঈমান আত্মিক প্রশান্তি ও প্রকৃত সুখ লাভের অন্যতম কারণ।[২১]

১. আত্মিক প্রশান্তিতেই সুখ

আত্মিক প্রশান্তি নিঃসন্দেহে সুখের প্রধান উৎস। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পারি, সর্বাধিক অস্থিরচিত্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ তারাই, যারা ঈমানের নিয়ামত ও বিশ্বাসের শীতলতা থেকে বঞ্চিত।

এই প্রশান্তি—যেমনটা ড. ইউসুফ কারজাবি তার মূল্যবান গ্রন্থ *আল-ঈমান ওয়াল হায়াতে* বলেছেন—আল্লাহ প্রদত্ত এক রুহ এবং এমন নুর, যেখানে গিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ব্যক্তি স্বস্তি অনুভব করে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোক প্রশান্তি লাভ করে, যার মাধ্যমে দুঃখী সান্ত্বনা খুঁজে পায়, পরিশ্রান্ত ব্যক্তি আরাম বোধ করে, দুর্বল সবল ও শক্তিশালী হয় আর দিশেহারা খুঁজে পায় পথের দিশা।

নীতিবান লোকদের অবশ্যই জানা থাকার কথা যে, প্রশান্তি লাভের সবচেয়ে সঠিক নিকটবর্তী ও নিরাপদ পথ হলো ঐশী ওহির নিষ্কলুষ পথ। এটিই সেই ভ্যাকসিন, যা মানুষকে ধ্বংসাত্মক সংশয় ও ভয়ানক দুশ্চিন্তা থেকে সুরক্ষিত করে রাখে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

---

[২১] সূত্র: আল-হিলাল ম্যাগাজিনে ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত ড. কামেল ইয়াকুবের প্রবন্ধ

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم

সুতরাং আপনি সেটাই আঁকড়ে থাকুন, যার ওহি আপনাকে পাঠানো হয়েছে। নিঃসন্দেহে আপনিই সরলপথে অধিষ্ঠিত আছেন। [সুরা জুখরুফ, আয়াত : ৪৩]

সুস্পষ্ট সত্য ও সরল পথের ওপর অধিষ্ঠিত থাকার অনুভূতি ও বিশ্বাস মানুষের এমনই এক অনুভুতি যে, আল্লাহর ওহি ও হিদায়েতে বিশ্বাসী ছাড়া এ অনুভূতি আর কারো অনুভব হতে পারে না।

অস্তিত্বের বড় বড় বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে বিশ্বাস অর্জনের একক পথ শুধুই ওহি। ওহি ছাড়া বিশ্বাস কিছুতেই অর্জিত হবে না। বিশ্বাস বিনে প্রশান্তি লাভ করা যায় না। আর প্রশান্তি না হলে সুখেরও সাক্ষাৎ মিলবে না।

কোনো এক সালাফ বলেছেন, আমি বাস্তবেই জান্নাত এবং জাহান্নাম দেখেছি! তাকে বলা হলো, দুনিয়াতে থাকাবস্থায় আপনি তা কী করে দেখতে পেলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই আমিও তাঁর চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। আমার দুচোখ দিয়ে জান্নাত-জাহান্নাম অবলোকন করার চাইতে রাসুলের দুচোখ দিয়ে অবলোকন করা আমার কাছে অত্যধিক প্রিয়। কেননা, আমার চোখ তো বিভ্রান্ত হতে পারে এবং সীমালঙ্ঘনও করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর রাসুলের চক্ষু মোবারক না বিভ্রান্ত হতে পারে, আর না করতে পারে সীমালঙ্ঘন।

এরূপ প্রশান্তিকর ঈমানের দ্বারাই মুমিন সৃষ্টির বড় বড় রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ফেলেন। যখন সে জানতে পারে নিজের সূচনা ও সমাপ্তি, তখন তার অন্তর থেকে সংশয়ের গিঁট খুলে যায় এবং জীবন থেকে দূরীভূত হয়ে যায় হাজারও প্রশ্ন।

আর যারা অবিশ্বাসী, ইহজগতেই অসংখ্য চিন্তাভাবনা তাদের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে এবং তাদের নাজেহাল করে তোলে হরেকরকমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। তখন সে নিজের সহজাত বাসনা পূরণ করবে, না যে-সমাজে বসবাস করে সে সমাজকে তুষ্ট করবে—এ নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে! অথচ মুমিন এসব জঞ্জাল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ও নিরাপদ থাকে। সে তো তার সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে একটি লক্ষ্যে সীমিত করে ফেলে। অতঃপর সে এর প্রতি আগ্রহী হয় এবং এর জন্যই দৌড়ঝাঁপ করতে থাকে। আর তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এ লক্ষ্য অর্জন করতে মানুষের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির সে তোয়াক্কা করে না।

একইভাবে মুমিন তার সমুদয় চিন্তাকে এক চিন্তা বানিয়ে নেয়। আর তা হলো সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে চলা। এটিই সেই পথ, যে পথ তাকে প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক নামাজে সে একাধিকবার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলে— إهدنا الصراط المستقيم আমাকে সরলপথ প্রদর্শন করুন। [সুরা ফাতেহা, আয়াত : ৬] এ পথই একমাত্র পথ, যেখানে কোনো বক্রতা নেই। নেই কোনো প্যাঁচগোজও। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله .

> আর এটি আমার পথ, যা সরল। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করো এবং অন্য পথসমূহের অনুসরণ করো না; তাহলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। [সুরা আনআম, আয়াত : ১৫৪]

চারিত্রিক মানদণ্ড মুমিনের কাছে সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত। আর তা হলো, আপন রবের সন্তুষ্টি এবং তাঁর আদেশ মান্য করা ও নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা। সাথে সাথে এই বিশ্বাসও রাখা যে, এতেই রয়েছে তার ইহকাল ও পরকালের সুখ-শান্তি এবং তার ও সকল মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গল।

মুমিনের অন্তর ও বক্ষের চেয়ে অধিক বড় ও প্রশস্ত বক্ষ আর কারো নেই। তার বক্ষে সকলেরই জায়গা মিলে। চাই তাকে দেখা যাক বা না যাক। এর বিপরীতে নাস্তিক এবং আল্লাহ ও পরকালে সন্দিগ্ধ লোকের অন্তরের চেয়ে অধিক সংকীর্ণ ও ছোট মন আর হয় না। কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

فمن اتبع هداي فلا يضل و لا يشقى و من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا .

> সুতরাং যে আমার হিদায়েতের অনুসরণ করে, সে বিপথগামী হয় না এবং হতভাগ্য হয় না। আর যে আমার উপদেশ থেকে বিমুখ হয়, তার জন্য রয়েছে সংকটাপন্ন জীবন। [সুরা ত্বহা, আয়াত : ১৩-১২৪]

সুতরাং তুমি যদি আল্লাহর হিদায়েত থেকে বিমুখ—এমন কাউকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং বাহ্যিক ভোগবিলাসে দেখতে পাও, তাহলে এটি যেন তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তোমাকে ধাঁধায় না ফেলে দেয়। কারণ, প্রকৃত সংকট তো রয়েছে তাদের

অন্তরে। আর অন্তর সংকীর্ণ হলে গোটা জীবনটাই সংকীর্ণ হয়ে যায়। আর মনটা সচ্ছল হলে গোটা জীবনই সচ্ছলতায় ভরে যায়।

মুমিন কত শান্তি এবং তৃপ্তিই না অনুভব করে, যখন দুর্দিনে ও কঠিন সময়ে আপন রবের কাছে আশ্রয় নেয় এবং নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত দুআ বাক্য পাঠ করে তাঁর দরবারে দুআ করে—

> اللَّهُمَّ رب السموات السبع و رب العرش العظيم ربنا و رب كل شيء فالق الحب و النوى منزل التوراة و الإنجيل و القرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء أنت الآخر فليس بعدك شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين و أغنني من الفقراء .

> হে আল্লাহ, হে সাত আসমানের রব, মহান আরশের অধিপতি, আমাদের রব এবং সমস্ত কিছুর রব, বীজ বিদীর্ণকারী, তাওরাত ইঞ্জিল ও কুরআন অবতীর্ণকারী, আমি আপনার কাছে পানাহ চাই সকল প্রাণীর অনিষ্ট থেকে, সবকিছু আপনার কব্জায় আছে। আপনিই প্রথম; কারণ আপনার আগে কোনো জিনিস নেই। আপনিই শেষ; কারণ, আপনার পর কোনো কিছু নেই। আপনিই সদা ভাস্বর; কারণ, আপনার ওপর কোনো কিছু নেই। আপনিই নিগূঢ় সত্তা; কারণ, আপনার নিচে কেউ নেই। আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।[২২]

নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোজগতে সেদিন কত আত্মিক প্রশান্তি এবং সুখই না ঢেলে দেওয়া হয়েছে, যেদিন তিনি রক্তাক্ত পদযুগল ও সম্প্রদায়ের দুর্ব্যবহারে ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে ফিরে এলেন তায়েফ থেকে। অতঃপর শুধু আসমানের দিকে দুহাত উত্তোলন করলেন এবং তাঁর দরজাসমূহে করাঘাত করলেন নিম্নোক্ত জীবন্ত ও আবেগঘন শব্দাবলি দিয়ে দুআ করে, ফলে এ শব্দাবলি তাঁর হৃদয়ে বইয়ে দেয় শান্তি ও শীতলতার বাতাস। সেদিন তিনি রবের দরবারে বলেছেন,

> اللَّهُمَّ إليك أشكو ضعف قوتي و قلة حيلتي و هواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين و ربي إلى من تكلني إلى بعيد

[২২] সহিহ মুসলিম।

يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات و صلح عليه أمر الدنيا و الآخرة من أن تنزل بي علي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى و لا حول ولا قوة إلا بك.

হে আল্লাহ, আমি কমজোর, আমার তেমন কোনো কৌশল জানা নেই, আমি মানুষের কাছে হীন। হে বড় মেহেরবান, আপনি তো দুর্বলদের রব এবং আমারও রব। কার হাতে আমাকে আপনি ন্যস্ত করছেন? এমন অনাত্মীয়ের কাছে, যে আমায় দেখে মুখ গোমরা করবে। নাকি এমন কোনো শত্রুর হাতে ন্যস্ত করছেন, যার হাতে আমার দায়দায়িত্ব অর্পণ করেছেন? যদি আপনি আমার ওপর গোস্বা না করেন, তাহলে আমি আর কোনো কিছুর পরোয়া করি না। কিন্তু আপনার পক্ষ থেকে আমার সুস্থতা বড় প্রয়োজন। আপনার রাগ ও ক্রোধ থেকে আমি পানাহ চাই, আপনার সেই নুরানি তাজাল্লির মাধ্যমে, যার কারণে অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় বিষয়ে কল্যাণকর হয়। সন্তুষ্টি সব আপনার জন্যই, যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট হন। আপনি ছাড়া কোনো শক্তি নেই। নেই কোনো ক্ষমতা ও দাপট।[২৩]

দুঃখের যে সকল কারণ মানুষের থেকে আত্মিক প্রশান্তি ও মনের সুখ হাতিয়ে নেয়, তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো, অতীত নিয়ে আফসোস করা এবং বর্তমানের ওপর ক্রোধান্বিত হওয়া আর ভবিষ্যতের শঙ্কিত হওয়া। যেমন, কালের কোনো বিপদ কোনো মানুষের ওপর আপতিত হলো। এ বিপদ মাসের পর মাস, কখনোবা বছরের পর বছর যাবৎ তার পেছনে লেগেই থাকে। এ মুসিবতের ব্যথা-বেদনা সে ভোগ করতে থাকে আর অতীতের স্মৃতিচারণ করে বলতে থাকে, হায়, আমি অমুক কাজটি যদি না করতাম! আহ, আমি যদি অমুক কাজটি করতাম!

এ কারণেই মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ মানুষকে অতীতের দুঃখ-যাতনা ভুলে গিয়ে আজকের বাস্তবতা নিয়ে বেঁচে থাকার নসিহত করেন। কারণ, অতীত একবার চলে যাবার পর তা আর কখনো ফিরে আসে না।

[২৩] হাদিসটি ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন।

আমেরিকার কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক লেকচারার তার ছাত্রদের সামনে এ বিষয়টিকে অভিনব পন্থায় চিত্রায়ন করেন। তিনি তার ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কারা কারা কাঠ রাঁদা/মসৃণ করেছ? সাথে সাথে অনেকে হাত উঠাল। দ্বিতীয়বার তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, কাঠের গুঁড়ি রাঁদা করেছে কারা কারা? এবার একটি হাতও উঠল না। তখন লেকচারার বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই কারোর পক্ষেই সম্ভব নয় গুঁড়ো কাঠ রাঁদা করা। কারণ, এটা গুঁড়ো হয়েই আছে। অতীতের সাথে বর্তমানের উদাহরণটা ঠিক এমনই। সুতরাং অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির কারণে যদি কখনও দুঃখকষ্ট তোমাদের ঘিরে ধরে, তখন তোমরা জেনে রেখো, তোমরা গুঁড়ো কাঠ রাঁদা করছ।

ডেল কার্নেগি তার একটি গ্রন্থে এই তথ্যটি উদ্ধৃত করেন। আরেক লেকচারারের বক্তব্য তিনি বর্ণনা করেন। লেকচারার বলেন, অতীত নিয়ে টেনশন তোমার একদমই কোনো উপকারে আসে না। যেরূপ আটা পিষলে কিংবা কাঠের গুঁড়ি মসৃণ করার দ্বারা কোনো উপকার নেই। অতীত নিয়ে পেরেশানি তোমার সর্বসাকুল্যে যতটুকু উপকার করে তা হলো, তোমার চেহারা কুঁচকে দেবে কিংবা তোমার পাকস্থলিতে বড় কোনো জখম তৈরি করে দেবে![২৪]

কিন্তু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে গিয়ে মানুষ যেই পেরেশানি ও টেনশন করে, মুমিনের মধ্যে তার কোনো স্থান তুমি দেখতেই পাবে না। এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হলো, আল্লাহর ওপর মুমিন ব্যক্তির ভরসা ভবিষ্যতের ব্যাপারে তার চিন্তা-পেরেশানিকে দূর করে দেয়। আল্লাহ তার জন্য যা বণ্টন করে রেখেছেন, তার প্রতিই সে পরিতুষ্ট থাকে। সে বিশ্বাস করে, তার বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালাই ইনসাফপূর্ণ। আল্লাহই ন্যায়বিচারক। এ কারণেই সুখ ছিনতাইকারী পেরেশানির কোনো যৌক্তিকতা থাকে না।

আল্লাহকে ভালোবেসে এবং আল্লাহর জন্য ভালোবেসে মুমিন যেই সুখ লাভ করে, সেই সুখের গভীরতা সবকিছুর গভীরতা থেকে ঊর্ধ্বে। এর স্বাদ শুধু সত্যিকার মুমিনরাই অনুভব করেন। এর পরিবর্তে তুমি তারা অন্য কিছু গ্রহণও করে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি জিনিস বিদ্যমান থাকবে, সেগুলোর কারণে সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে। ১. আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল তার কাছে সবকিছু থেকে সর্বাধিক প্রিয় হবে। ২. মানুষকে ভালোবাসবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। ৩. কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে এরূপ ঘৃণা করবে, যেরূপ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।[২৫]

---

[২৪] ড. ইউসুফ কারজাবী রচিত আল-ঈমান ওয়াল হায়াত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৯৩-১৩২। কিছুটা পরিমার্জনসহ
[২৫] মুত্তাফাক আলাইহি

অধ্যাপক নাশআত মিসরি তার 'আন্নাবিইউ বাসিমান' গ্রন্থে উল্লেখ করেন—মুত্তাকিদের সম্পর্কে আলোচনাকালে আমরা প্রায়শই এ কথাটি বলে থাকি যে, অমুককে দেখলে তোমার কাছে মনে হবে তার চেহারায় যেন নুর ঝলমল করছে। আসলে এই নুর চেহারার অভ্যন্তরে থাকে, থাকে সাজানো আনন্দ ও খুশি অনুভবের মিশ্রিত রূপ হিসেবে। মুমিন সেইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেরেশানির ঊর্ধ্বে অবস্থান করে, যেগুলো দুনিয়াদারদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। তার সম্মুখে যেই সমস্যা দেখা দেয়, সবগুলোকেই সে আপন সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখে মেনে নেয়। তাদের দলভুক্ত হয় না, যারা নিজের প্রতি কিংবা মানুষের প্রতি জুলুম করে। ফলে সে নিজের প্রতি তুষ্ট থেকে জীবিত থাকে। অন্যদের সন্তুষ্টির অনুভূতি তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্যের দিকেও সে ধাবিত হয়।

২. সুখ আল্লাহ তাআলার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকার মধ্যে

আল্লাহ তাআলার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ধৈর্যের চেয়েও উঁচু স্তরের। এ স্তরে কেবল সেই পৌঁছতে পারে, যাকে আল্লাহ দান করেন পরিপূর্ণ ঈমান এবং সবরে জামিল। তাই আপনি আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট ব্যক্তিকে দেখতে পাবেন, তিনি যে অবস্থায় আছেন, সে অবস্থাতেই খুশি ও তুষ্ট। চাই সেটি কোনো রোগ কিংবা হোক দারিদ্র্য ও বিপদাপদ। কারণ, এসব তো আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে। এমনকি তিনি নিজের ওপর আপতিত বিপদকেও আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত বলে মনে করেন।

এ কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম দুআ ছিল—

أسألك الرضا بالقضاء

> হে আল্লাহ, আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেন আপনার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকতে পারি।

জয়নুল আবেদিন বলেন—আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ইয়াকিনের সর্বোচ্চ স্তর।

যারা আল্লাহর ফয়সালা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেন, তাদের গুণাগুণ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছেন—

لأحدكم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء

তোমাদের কেউ দান ও অনুগ্রহ পেয়ে যতটা খুশি হয়, তাদের কেউ বিপদে আক্রান্ত হলে এর চেয়ে অত্যধিক আনন্দ ও পুলক বোধ করে।[২৬]

এমনই এক বাস্তব ঘটনা ইতিহাসের কল্যাণে আমরা জানতে পারি। মহান সাহাবি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তিনি ছিলেন মুস্তাজাবুদ্দাওয়াত অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি, যার দুআ কবুল হয়। লোকজন তাঁর কাছে এসে নিজেদের সমস্যার জন্য দুআ চাইতেন। তিনি দুআ করে দিলে তা কবুল হয়ে যেত। তাঁর চোখ অন্ধ হতে দেখে এক লোক তাঁকে বললেন, চাচা, আপনি তো মানুষের জন্য দুআ করেন। আপনার এ অবস্থায় আপনি যদি নিজের জন্য একটু দুআ করতেন, তাহলে তো আল্লাহ আপনার চক্ষু ফিরিয়ে দিতেন। মহান সাহাবি তখন বললেন, বেটা, আল্লাহর ফয়সালা আমার কাছে আমার চক্ষু থেকে অধিক উত্তম।

সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, কোন ব্যক্তির ওপর সবেচেয়ে বেশি বিপদ আসে? তিনি বললেন, এক্ষেত্রে প্রথম হলেন নবিগণ। অতঃপর যে যত বেশি শ্রেষ্ঠ, তার ওপর তত বেশি বিপদ আসে। সুতরাং মানুষকে তার দ্বীন অনুপাতে বিপদ দেওয়া হয়। যদি সে দ্বীন পালনে সাধারণ হয়ে থাকে, তাহলে সেই হিসেবেই তাকে বিপদ দেওয়া হয়। আর যদি দ্বীন পালনে সে হয় কঠোর, তাহলে তাকেও সেই অনুযায়ী বিপদের মুখোমুখি করা হয়। এভাবেই সে যতদিন ভূপৃষ্ঠে চলাচল করে, ততদিন বালা-মুসিবত তার ওপর এমনভাবে লেগেই থাকে যে, মৃত্যুর সময় তার আর কোনো গুনাহ থাকে না।[২৭]

এক আধ্যাত্মিক গুরু অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে যায় এবং চোখে এমন যন্ত্রণা শুরু হয় যে, ব্যথানাশক কোনো ওষুধই কাজ করে না। এ অবস্থায় তাঁর এক শিষ্য তাঁর কাছে এসে দেখেন, তিনি কাঁদছেন। তাই শিষ্য তাঁকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করে এবং এ বিপদে তাঁকে সবর করতে বলে। আধ্যাত্মিক গুরু তাকে বললেন, আমি চোখ ব্যথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কান্নাকাটি করছি না। বরং আল্লাহ আমাকে বিপদ দেওয়াটা উপযুক্ত মনে করেছেন—এই কারণে খুশিতে আমি কান্না জুড়ে দিয়েছি!

হাদিসে এসেছে—

من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس و من التمس رضا الناس بسخط الله وكله إلى الناس .

[২৬] হাদিসটি আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেন

[২৭] হাদিসটি ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন।

যে মানুষের অসন্তুষ্টি উপেক্ষা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করে, মানুষের বিপদাপদের মোকাবিলায় আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি উপেক্ষা করে মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করে, তাকে তিনি মানুষের হাতে ন্যস্ত করেন।[২৮]

যারা আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্ট হয় এবং সংশয় পোষণ করে, তারা কখনো আনন্দের স্বাদ পায় না। তাদের গোটা জীবনটাই অন্ধকার ও আঁধারে আচ্ছন্ন থাকে। এমন ব্যক্তি সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তা ও পেরেশানিতে থাকে। তাদের মন থাকে সংকীর্ণ। নিজের বেলায়ও এবং নিজের আশপাশের মানুষদের বেলায়ও।

প্রকৃত মুমিন নিজের ব্যাপারে তুষ্ট থাকে এবং আপন রবের প্রতি থাকে সন্তুষ্ট। সে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস রাখে, তার ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনা তার নিজের পরিকল্পনা থেকে উত্তম এবং মা-বাবার চাইতেও তার প্রতি আল্লাহর দয়া অনেক বেশি। সে একান্তে রবের দরবারে বলে—

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير

যাবতীয় কল্যাণ আপনার হাতেই। আপনি তো সবকিছুর ওপরই ক্ষমতাবান। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ২৬]

যারা আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্ট, তারা সন্তুষ্টির স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে। এমনকি তারা যে বিপুল নিয়ামত উপভোগ করছে, তার স্বাদও তারা অনুভব করতে পারে না। হ্যাঁ, হয়তো তারা সেসব নিয়ামত পেয়ে গেছে কিংবা সহজে লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তারা সবসময় বলে, অমুক অমুক জিনিস আমাদের কমতি আছে। অমুক অমুক বস্তু আমরা চাই। কখনো বলে না, আমাদের কাছে অমুক অমুক জিনিস আছে।

মুমিন তার আশপাশে থাকা প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই নিজের জন্য আল্লাহর নিয়ামত অনুভব করেন। আসমান এবং জমিনের প্রতিটি কণাতেই তিনি প্রত্যক্ষ করেন আল্লাহ তাআলার অপার নিয়ামত। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত নিয়ে সন্তুষ্ট। সর্বাবস্থায় ও সবসময়।

৩. সুখ অল্পে তুষ্টি এবং পরহেজগারিতে

দুনিয়া এবং দুনিয়ার উপকরণের প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণ স্বভাবগতভাবেই মানুষের মাঝে বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনে রাব্বে কারিম ইরশাদ করেন—

[২৮] হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন।

زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الأنعام و الحرث ذلك متاع الحياة الدنيا و الله عنده حسن المئاب .

নারী, সন্তানাদি, কাড়ি কাড়ি স্বর্ণ-রুপা, বিশিষ্ট উট, চতুষ্পদ জন্তু ও শস্যক্ষেতের মতো আকর্ষণীয় বস্তু মানুষের কাছে সুশোভিত করে তোলা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম ঠিকানা। [সুরা আল ইমরান, আয়াত : ১৪]

কিছু মানুষ এমন আছে, দুনিয়া যাদের বুদ্ধি গ্রাস করে নিয়েছে। তাই এখন সে দুনিয়ার মোহে পড়ে থাকে এবং দুনিয়ার প্রতি লোভাতুর হয়ে থাকে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আদম সন্তানের যদি সম্পদের দুটি উপত্যকা থাকত, তাহলে তৃতীয় আরেকটি উপত্যকা কামনা করত। আদম সন্তানের পেট শুধু মাটিই পূর্ণ করতে পারে। আর যে কেউ তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।[২৯]

কিছু মানুষ দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টার জন্যই পরিশ্রম করে। কিন্তু দুনিয়ার ততটুকু উপভোগ করে, যতটুকু আল্লাহ তাকে দান করেন এবং সে এতেই তুষ্ট ও খুশি থাকে। এটিই মুমিনের জীবন এবং এটির নামই প্রশংসনীয় কানাআত বা অল্পে তুষ্টি।

আবার কিছু মানুষ জীবনের ভোগের সামগ্রী এবং তার চাকচিক্যকে ক্ষণস্থায়ী বস্তু ও সাময়িক স্বাদ হিসেবে দ্যাখে। তাই সে দুনিয়ার ততটুকুই গ্রহণ করে, যতটুকু তার জন্য অত্যাবশ্যক। এভাবেই সে সামান্য পরিমাণ হালাল কামাই নিয়ে জীবনযাপন করে।

আবার কিছু মানুষ পরহেজগারির এমন স্তরে পৌঁছে গেছে, যেখানে কম সংখ্যক মানুষই পৌঁছাতে পারে। এই শ্রেণির মানুষই সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ। বর্ণিত আছে, কোনো এক আলিমের স্ত্রী নিজ হাতে সুতো কাটতেন এবং সেই সুতো দিয়ে নিজ হাতেই কাপড় বুনতেন। আলিম স্বামী সেই পোশাকই পরিধান করতেন। একবার তিনি একটি নতুন জামা পরিধান করলেন। জামাটি তার কাছে বেশ খসখসে মনে হচ্ছিল। এ অবস্থা এত দীর্ঘ সময় চলছিল যে, তিনি জামাটি খুলতে বাধ্য হলেন। এর পর তিনি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাপড়টি কীভাবে বুনেছ? স্ত্রী বললেন, তিনি জামাটির কিছু অংশ রাস্তার আলোতে বুনেছেন। এ উত্তর শুনে তিনি কাপড়টি সদকা করে দিলেন।

আরও বর্ণিত আছে, এক মহিলা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, রাতের বেলা প্রহরীরা হাতে আলোর মশাল নিয়ে আমাদের সামনে

---

[২৯] সূত্র: হাদিসটি ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনা করেন।

দিয়ে যায়। এ সময় তারা আমাদের ঘরের সামনে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকে। আমি যদি তাদের মশালের আলোতে সুতা কাটি, তাহলে কি এটা আমার জন্য হালাল হবে? ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ এ প্রশ্ন শুনে মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি বিশর আল-হাফির বোন। তখন তিনি জবাব দিলেন, পরহেজগারি জন্ম হয় তোমাদের ঘরে। সুতরাং তোমার জন্য তা হালাল হবে না।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, বাগদাদ শহরের এক ব্যক্তির কাছে তাঁর কিছু পাওনা ছিল। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে সেই লোকের কাছে গমন করেন। সময়টি ছিল দ্বিপ্রহর। প্রচণ্ড গরম। তিনি লোকটির ঘরের দরজায় আওয়াজ দিলেন এবং দরজার ওপর গরম থেকে বাঁচার জন্য একটি ছাউনি থাকায় তিনি দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন। এ দৃশ্য দেখে তাঁর কোনো এক ছাত্র জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কেন ছাউনি থেকে সরে এসে রৌদ্রে দাঁড়ালাম? তিনি তাকে উত্তর দিলেন, ছাউনির মালিকের কাছে আমার পাওনা আছে। সুতরাং এ অবস্থায় তার ছাউনিতে দাঁড়ানোর অর্থ ঋণ দিয়ে আমি কোনো সুবিধা গ্রহণ করছি। আর এটি সুদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তাই এমনটি করেছি।

আরো বর্ণিত আছে, এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাসবিহ জপতে জপতে মসজিদ থেকে বের হলো। ইত্যবসরে এক ভিক্ষুক তার কাছে কিছু সদকা চাইল। কিন্তু ধনী লোকটি তার দিকে খেয়াল করেনি। কিছুকাল পর তার স্মরণ হলো, সে তো ভিক্ষুককে কিছু দেয়নি। তাই সে ফিরে গিয়ে কিছু দেওয়ার জন্য লোকটির খোঁজ করছিল। খোঁজ করতে করতে দেখতে পেল, লোকটি ছোট ছোট কয়েক টুকরো রুটি খাচ্ছে। এতে সে লজ্জিত হয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইল এবং তার কাছে সদকা পেশ করল। কিন্তু ভিক্ষুক এবার সদকা গ্রহণ করতে নারাজ। সে বলল, এখন আমার রব আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন। সুতরাং আপনার যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনিও তাঁর দরবারে প্রার্থনা করবেন।

আব্বাসি খলিফা হিশাম ইবনু আবদুল মালিক কাবাঘরের সম্মুখে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতি সালেম ইবনু আবদুল্লাহকে বললেন, আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলুন। সালেম বললেন, আল্লাহর কসম, তার ঘরে এসে অন্য কারো কাছে চাইতে আমি লজ্জা বোধ করি। এর পর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হন, তখন খলিফা হিশাম বললেন, এখন তো আপনি আল্লাহর ঘর থেকে বের হয়েছেন। সুতরাং এখন আমার কাছে চান। সালেম বললেন, দুনিয়ার প্রয়োজনীয় কিছু চাইব নাকি আখিরাতের? হিশাম বললেন, দুনিয়ার প্রয়োজনীয় কিছুই চান। এবার সালেম বললেন, এ দুনিয়ার মালিক যিনি তাঁর কাছেই তো আমি এ দুনিয়া চাইনি। তাহলে যে এর মালিক নয়, তার কাছে কী করে চাইতে পারি![৩০]

---

[৩০] ড. মুহাম্মাদ ফাইজ আলমাত রচিত মিন কুনুজিল ইসলাম

বধির হাতেম তাঁর সন্তানদের বললেন, আমি হজে যেতে চাই। এ কথা শুনে ছেলেরা কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাদের কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? ছেলেদের এমন প্রশ্নে হাতেমের কন্যা বলে উঠলেন, বাবাকে হজে যেতে দাও। তিনি কোনো রিজিকদাতা নন। এর পর তিনি হজে চলে গেলেন। এদিকে পরিবারের লোকজন খাবার শেষ হয়ে যাওয়ায় ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে এবং তারা মেয়েটিকে তিরস্কার করতে থাকে। তাদের এহেন অবস্থা অবলোকন করে মেয়েটি মনে মনে আল্লাহর কাছে এই দুআ করে যে, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এদের সামনে লজ্জিত করবেন না।

ইতিমধ্যেই শহরের আমির তাদের সামনে দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি যাত্রাবিরতি করে তাদের কাছে পানি চাইলেন। হাতেমের ঘরের লোকজন একটি নতুন মগে করে তাকে ঠান্ডা পানি দেয়। পানি পান করে আমির জিজ্ঞেস করলেন, এটি কার বাড়ি? ঘরবাসী বলল, এটি হাতেমের বাড়ি। উত্তর শুনে আমির ঘরের মধ্যে একটি স্বর্ণের হার নিক্ষেপ করলেন এবং তার সঙ্গীদের বললেন, যে আমাকে ভালোবাস, সেও আমার অনুরূপ করো। অতঃপর তার পাশে থাকা সকলেই অনুরূপ করলো। হাতেমের মেয়ে এ অবস্থা দেখে কাঁদতে কাঁদতে বের হলো। তখন তার মা তাকে বলল, তুমি কাঁদছ কেন, আল্লাহ তো আমাদের অধিক রিজিক দান করেছেন? মেয়েটি উত্তরে বলল, একজন মাখলুক আমাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়াতে আমরা ধনী হয়ে গেলাম। যদি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আমাদের দিকে দৃষ্টি দিতেন, তাহলে কী অবস্থাই না হতো!

ইমাম তাবারি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *তারিখুত তাবারিতে* উল্লেখ করেন, উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ খলিফা থাকাবস্থায় এক লোককে আদেশ করলেন, সে যেন তাঁর জন্য আটটি রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে একটি কাপড় কিনে আনে। আদেশমতো লোকটি কাপড় ক্রয় করে তাঁর হাতে অর্পণ করলো। উমর ইবনু আবদুল আজিজ কাপড়ে নিজের হাত রেখে বললেন, কাপড়টা বেশ সুন্দর এবং মোলায়েম। এতে কাপড় আনয়নকারী লোকটি হেসে দিল। উমর ইবনু আবদুল আজিজ তাকে হাসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি হাসলে কেন? লোকটি উত্তরে বলল, খলিফা হবার আগে আপনি আমাকে নকশা করা রেশমি চাদর কিনতে বলতেন। আমি তা এক হাজার রুপার মুদ্রা দিয়ে তা কিনে আনতাম। আর কাপড়ের গায়ে হাত বুলিয়ে সে সময় বলতেন, কী খসখসে কাপড়! আর আজ আটটি রৌপ্যমুদ্রার কাপড় আপনার কাছে নরম ও কোমল মনে হচ্ছে! এ কথা শুনে তিনি বললেন, যে লোকটি এক হাজার দিরহাম দিয়ে কাপড় ক্রয় করে, সে লোকটি আল্লাহকে ভয় করে বলে আমার মনে হয় না। অতঃপর তিনি বললেন, এই শোনো, আমার একটি উচ্চাভিলাষী মন আছে। যখনই আমি কোনো পদ পেয়েছি, তার চেয়ে আরো উচ্চপদ চেয়েছি। যখন আমি আমির হলাম, তখন আমার মন খলিফা হতে চেয়েছে। আর যখন খলিফা হলাম তখন আমার মন এর চেয়ে আরও বড় কিছুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর সেটি হলো জান্নাত!

অল্পে তুষ্ট লোকেরা তাদের জন্য যা বরাদ্দ তার চাইতেও কম সম্পদে পরিতুষ্ট থাকে; যাতে করে অন্যদের জন্যও একটা অংশ রেখে যেতে পারে এবং তারাও তাদের মতো সম্পদ ভোগ করতে পারে।

প্রখ্যাত সাহাবি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ছেলেকে বললেন, বাবা, যদি ধনাঢ্যতা চাও, তাহলে অল্প তুষ্টের সাথে চাও। কারণ, যদি অল্পে তুষ্টির গুণ না থাকে, তাহলে সম্পদ তোমাকে কভু ধনী বানাতে পারবে না।

কবি বলেন—আঁখিযুগল কখনো জাগ্রত হয়, কখনো ঘুমায়—এমন সব বিষয়ের জন্য, যা হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। সুতরাং যতটুকু সম্ভব চিন্তা-পেরেশানিকে দূরে ফেলে দাও। কারণ, এগুলো বয়ে বেড়ানো পাগলামিই বটে।

গতকাল তোমার যা ছিল না, সেগুলোর বেলায় তো একজন রব তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন। আগামীকাল যা লাগবে, সেগুলোর ব্যাপারেও তিনি অবশ্যই তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই বাণী বড়ই চমৎকার যেখানে তিনি বলেছেন—তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজ আস্তানায় নিরাপদ থাকে, শারীরিকভাবে সুস্থ এবং একদিনের খাবার থাকে, তাকে যেন গোটা পৃথিবীটাই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।[৩১]

হুবহু এই মর্মকথাই এক কবি তার নিম্নোক্ত কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন—কোনো যুবকের ভাগ্যে যদি ইসলাম ও আহার একই সাথে জুটে যায় আর তার শরীর থাকে সুস্থ এবং সে থাকে নিরাপদ; তাহলে সে যেন সমগ্র পৃথিবীর মালিক বনে গেল এবং তা একত্রিত করে নিল। তাই অনুগ্রকারী মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা তার ওপর অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং কী সুখ সেই ব্যক্তির, যাকে আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন আর সে-ও তাঁর শোকর গুজার বান্দাদের দলভুক্ত হয়েছে! সুখী ও ভাগ্যবান তো সে নয়, যে যা কামনা করে তাই পায়। বরং তার চেয়েও বড় সুখী তো সেই, যে নিজের কাছে যা আছে তা নিয়ে পরিতুষ্ট হয়।

ড. ইউসুফ কারজাবি তাঁর *মুশকিলাতুল ফাকরি ও কাইফা আ-লাজাহাল ইসলাম* গ্রন্থে লিখেছেন—মানুষ কানাআত তথা অল্প তুষ্টি শব্দটির ওপর বড় জুলুম করেছে। সুতরাং তারা মনে করে, কানাআত মানে নিম্নমানের বস্তু ও হীন জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া এবং উচ্চ মর্যাদা অন্বেষণে হিম্মত কম থাকলে সেটি নিয়ে তুষ্ট থাকা, আর ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বঞ্চনাকে সম্মানজনক মনে করা। আসলে এর সবই সুস্পষ্ট ভুল। কোনোটাই সঠিক নয়। কারণ, মানুষ স্বভাবগতভাবেই চরম দুনিয়া লোভী ও তার প্রতি ভীষণ আকৃষ্ট। তাই

[৩১] হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ। দেখুন, সহিহুল জামিইস সগির, হাদিস নং: ৬০৪২

মানুষকে ধনী হবার জন্য ধ্বংসাত্মক বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন পরিহার করে মধ্যপন্থার নীতি গ্রহণের পথ বাতলে দেওয়া দ্বীন ইসলামের জন্য আবশ্যক ছিল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—হে মানুষ সকল, আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় রিজিক অন্বেষণ করো। কোনো প্রাণীই তার রিজিক পূর্ণ না করে মৃত্যুবরণ করবে না, যদিও আসতে বিলম্বিত হয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তমরূপে রিজিক অন্বেষণ করো। যা হালাল শুধু তাই গ্রহণ করো। যা হারাম তা বর্জন করো।[৩২]

অল্প তুষ্টির দ্বিতীয় উপকার হলো, যে সকল বিষয় পরিবর্তন করার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই, সেসকল বিষয় থেকে আল্লাহ মানুষকে যা দান করেছেন, তা নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকবে। সুতরাং যা কিছু তার জন্য সহজ নয়, তার আকাঙ্ক্ষায় সে থাকবে না এবং যা অন্যকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাকে দেওয়া হয়নি সেদিকেও সে চোখ তুলে তাকাবে না। যেমন, বৃদ্ধ এই আকাঙ্ক্ষা করবে না যে, তার যৌবনের শক্তি ফিরে আসুক এবং বেটে যুবক শত আফসোস ও আক্ষেপ নিয়ে দীর্ঘকায় যুবকের দিকেও তাকিয়ে থাকবে না।

কোনো নেককার বলেন, হে আদম সন্তান, রিজিক কমে যাওয়ার ভয় করো না, যতদিন আল্লাহর ধনভান্ডার পরিপূর্ণ থাকবে। আর আল্লাহর খাজানা কখনো ফুরিয়ে যাবার নয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে গভীর সম্পর্ক করো না। যদি করো, তাহলে সর্বকল্যাণ তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। আল্লাহ তোমার জন্যে যা বরাদ্দ রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাক। তাহলে নিজের মন ও দেহকে শান্তিতে রাখতে পারবে। আগামীকালের রিজিক তাঁর কাছে দাবি করো না। যেরূপ তিনি তো তোমার কাছে আগামীকালের আমল দাবি করেননি। যে লোক তাঁর অবাধ্যতা করে, তাকেও তো তিনি ভুলে যান না। তাহলে যে তার আনুগত্য করবে, তাকে তিনি কি করেই বা ভুলতে পারেন? আর তিনি তো সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

৪. সুখ নেক আমলে

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস রেখে নেক আমল করে, তার ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা হলো, তিনি এরূপ ব্যক্তিকে দুনিয়াতে উত্তম জীবন দান করবেন এবং পরকালে তাকে তার কর্মের সর্বোত্তম বদলা দেবেন। কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

[৩২] হাদিসটি ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. বর্ণনা করেন

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, পুরুষ হোক কিংবা নারী, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করবো এবং তারা যা আমল করতো তার সর্বোত্তম প্রতিদান দান করবো। [সুরা নাহল, আয়াত : ৯৭]

'উত্তম জীবন' একটি ব্যাপক কথা। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের সুখ-শান্তি অন্তর্ভুক্ত। চাই তা যেদিক থেকেই হোক। মুফাসসিরদের শিরোমণি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উত্তম জীবন বলতে এখানে হালাল ও উত্তম রিজিক উদ্দেশ্য।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি উত্তম জীবনের ব্যাখ্যা করেন অল্প তুষ্ট দ্বারা। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এর আরেকটি ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, উত্তম জীবন মানে সুখ ও সৌভাগ্য। জাহ্‌হাক থেকে বর্ণিত, উত্তম জীবনের ব্যাখ্যা হলো, দুনিয়াতে হালাল রিজিক ও ইবাদত করা।

প্রকৃত সত্য হলো, উপরোক্ত সবগুলোই 'উত্তম জীবনে'র অন্তর্ভুক্ত।[৩৩]

৫. সুখ আল্লাহর মোরাকাবায়

ড. মুস্তফা আস-সিবাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—তোমার নফস যদি গোনাহ করতে উদ্যত হয়, তাহলে তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দাও। যদি ফিরে না আসে, তাহলে মহান ব্যক্তিদের আখলাকের কথা স্মরণ করিয়ে দাও। এর পরও যদি পিছিয়ে না আসে, তাহলে স্মরণ করিয়ে দাও, মানুষ জেনে গেলে কতটা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে। তার পরও যদি বিরত না থাকে, তাহলে জেনে নাও, সেই মুহূর্তে তুমি পশু হয়ে গেছে। নাবেগা বনি শাইবানের ভাষায়—

إن من يركب الفواحش سرا ❁ حين يخلو بسره غير خال

كيف يخلو و عنده كاتباه ❁ شاهداه و ربه ذو الجلال

[৩৩] তাফসিরে ইবনে কাসির

যে গোপনে অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, সে যখন গোপনে নির্জনে থাকে, তখন মূলত সে নির্জনে থাকে না।

কীভাবে সে নির্জনে থাকতে পারে; অথচ তার সাথে আছে তার আমল লেখার কাজে নিয়োজিত দুজন ফেরেশতা, দুজন সাক্ষী এবং মহান রব।

৬. সুখ নিয়ামত দানকারীর শোকরিয়া আদায়ের মধ্যে

অসংখ্য মানুষ মনে করে, আমাদের ওপর আল্লাহর সর্বাধিক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত হলো, সম্পদের নিয়ামত। অথচ আমরা যদি চিন্তা করি, তাহলেই দেখতে পাব, আমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামত অসংখ্য অগণিত এবং এ সকল নিয়ামত ধনী-গরিব সকলকেই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কান-চোখ-বিবেক-পরিবার-সন্তানাদি-সুস্থতা-বাতাস-পানি, এছাড়াও আরও বহু নিয়ামত আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের আংশিক মাত্র। রাব্বে কারিম ইরশাদ করেন—

و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها

> যদি তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত গণনা করো, তাহলে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। [সুরা নাহল, আয়াত : ১৮]

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি মনে করে, পানাহার কিংবা পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রেই কেবল তার ওপর আল্লাহর নিয়ামত আছে, অন্য কোনো ক্ষেত্রে নেই, তাহলে তার জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং তার শাস্তি অনিবার্য।

আমাদের বড় একটি গাফলতি হলো, আমরা কেবল তখনই নিয়ামতসমূহ উপলব্ধি করি, যখন তা হারিয়ে ফেলি। অথচ আমরা ভালো করেই জানি, নিয়ামত শোকরিয়া আদায় করলেই স্থায়ী হয় এবং অস্বীকার করলে চলে যায়। যেমনটি কুরআনে এসেছে:

و إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن كفرتم إن عذابي لشديد .

> আর স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেছেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করো, তাহলে আমি তোমাদের বাড়িয়ে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে আমার শাস্তি বড় কঠিন। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৭]

আবু হাজেম বলেন—প্রত্যেক এমন নিয়ামত যা আল্লাহর নৈকট্য এনে দেয় না, সেটিই মুসিবত।

তিনি আরও বলেন, যখন তুমি দেখবে, আল্লাহর নাফরমানি করা সত্ত্বেও আল্লাহ তোমাকে অবিরত নিয়ামত দিয়েই যাচ্ছেন, তখন তুমি তাকে ভয় করো।

কুরআনে কারিমে আছে—

سنستدرجهم من حيث لا يعلمون

আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করবো যে, তারা জানতেই পারবে না। [সূরা আরাফ, আয়াত : ১৮২]

ইমাম সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি তাদেরকে প্রচুর নিয়ামত দান করবেন। কিন্তু তাদেরকে শোকরিয়া আদায় করতে দেবেন না।

গোনাহ সকল সৎ আমল শেষ করে দেয় এবং নিয়ামতরাজিকে দূরীভূত করে দেয়। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—বিপদ এলে গোনাহের কারণেই আসে। আর সেটি তুলেও নেওয়া হয় একমাত্র তাওবার কারণে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

و ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير

তোমাদের ওপর যেকোনো মুসিবত আসে, তা তোমাদের হাতের কামাইয়ের কারণেই আসে। কিন্তু তিনি বহু গোনাহ মোচন করে দেন। [সুরা শুরা, আয়াত : ৩০]

তিনি আরও ইরশাদ করেন—

ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم و أن الله سميع عليم.

এটি এ কারণে যে, আল্লাহ যেই নিয়ামত কোনো কওমকে দান করেছেন, তা পরিবর্তন করতে চান না, যতক্ষণ তারা নিজেদের মনের অবস্থা পরিবর্তন না করে। আর আল্লাহ তো সবকিছুই শুনেন, সবকিছুই জানেন। [সুরা আনফাল, আয়াত : ৫৩]

৭. সুখ হালাল রিজিকে

এটি কত বড় খুশির খবর যে, মানুষ কষ্ট ও পরিশ্রম করে কোনো ভেজাল মিথ্যা ও প্রতারণা না করে হালাল কামাই নিয়ে ঘরে ফিরে আসবে এবং নিজের হালাল খাদ্য খেয়ে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে! আজকাল কত মানুষ এমন আছে, যারা ঘরে ফিরে

আসে ঠিকই; কিন্তু ঘুষ নিয়ে কিংবা মিথ্যা শপথ করে পণ্য বেচাকেনা করে অথবা মিথ্যার ওপর থেকেও আদালতের রায় নিজের পক্ষে এনে বা সম্পদের সাথে সামান্য হারাম যুক্ত করে।

সেই লোকটি কীভাবে ঘুমায়, যে হারাম মাল ভক্ষণ করে এবং তার দ্বারা নিজের দেহ ও স্ত্রী-সন্তানের দেহ বাড়ায়? কী করেই বা সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, যিনি তাকে তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, এ সম্পদ সে কোত্থেকে এনেছে এবং কোথায় খরচ করেছে?

ইমাম তাবারানি রাহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাস বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলাম—

يا ايها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا

> হে মানুষ, ভূপৃষ্ঠে যা আছে সেখান থেকে তোমরা হালাল ও উত্তম বস্তু আহার করো। [সূরা বাকার, আয়াত : ১৬৮]

তখন সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে মুস্তাজাবুদ্দাওয়াহ অর্থাৎ এমন ব্যক্তি বানান, যিনি দুআ করলেই কবুল হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, হে সাদ, তুমি হালাল খাদ্য গ্রহণ করো। তাহলেই মুস্তাজাবুদ্দাওয়াহ হয়ে যাবে। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, বান্দা তো নিজ পেটে হারাম খাদ্য নিক্ষেপ করে থাকে। কিন্তু এর কারণে তার চল্লিশ দিনের ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। যেকোনো বান্দার শরীর হারাম খাদ্য থেকে উদ্‌গত হয়, তার জন্য জাহান্নামই অধিক উপযুক্ত।[৩৪]

মুসলিম নারী ঘরের দুয়ারের সিঁড়িতে বসে থাকেন, আর তার স্বামী কাজে কিংবা বাজারে যাওয়ার সময় তাকে বলে দেন, সাবধান, আমাদের কাছে হারাম কোনো কিছু আনবেন না কিন্তু। আমরা না খেয়ে থাকতে পারব। কিন্তু আগুন সহ্য করতে পারব না!

---

[৩৪] ইমাম তাবারানি রহ. আলমুজামুস সগিরে হাদিসটি বর্ণনা করেন। ইমাম হাইসামি রহ. তাঁর মাজমাউজ জওয়ায়েদ গ্রন্থে (২/২৯১) বলেন, হাদিসটির সনদে এমন কিছু বর্ণনাকারী আছে, যাদের আমি চিনি না। আত-তারগিব ওয়াৎ তারহিব গ্রন্থে (খণ্ড:২ হাদিস নং:২৫৬৮) বলেছেন, হাদিসটি জয়িফ বা দুর্বল।

৮. সুখ বিপদাপদে সবর করার মধ্যে

দুনিয়ার বিপদ তো অনেক। আর মুমিন মাত্রই জানেন যে, দুনিয়া পরীক্ষার হল। তাই সে যেকোনো সময়ই পরীক্ষার আশা করতে পারে। কিন্তু এ পরীক্ষায় সেই সফল, যে বিপদকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী আচরণ করতে পারে।

শুরাইহ বলেন, আমিও তো অবশ্যই মুসিবতে আক্রান্ত হই। তখন আমি চারবার এর জন্য শোকরিয়া আদায় করি। প্রথমবার শোকরিয়া আদায় করি এজন্য যে, এর চেয়ে বড় বিপদ আল্লাহ আমাকে দেননি। দ্বিতীয়বার শোকরিয়া আদায় করি এজন্য যে, তিনি আমাকে এ মুসিবতে সবর দান করেছেন। তৃতীয়বার শোকরিয়া আদায়ের কারণ হলো, তিনি আমাকে মুসিবতের সময় 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ার তাওফিক দিয়েছেন। চতুর্থবার শোকরিয়া আদায় করি; কারণ, দ্বীনি বিষয়ে তিনি আমাকে মুসিবতে আক্রান্ত করেননি।

মুমিন এ ব্যাপারেও দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, যে বিপদ তার ওপর এসেছে তা কখনো তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার নয়। আর যে বিপদ তাকে ছাড়িয়ে গেছে, তা কখনো তার ওপর আসার ছিল না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন—

ما أصاب من مصيبة في الأرض و لا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لاتأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم و الله لا يحب كل مختال فخور.

ভূপৃষ্ঠে কিংবা তোমাদের ওপর যেকোনো বিপদই আসে, আমি তা সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। এটা তো আল্লাহর কাছে নিশ্চয়ই সহজ ব্যাপার। যাতে করে কোনো কিছু তোমাদের হাতছাড়া হলে তোমরা আফসোস না করো এবং কোনো কিছু তোমাদেরকে দিলে অতি পুলকিত না হও। আর নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীকে ভালোবাসেন না। [সুরা হাদিদ, আয়াত : ২২-২৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ সকল নবি ও নেককার বান্দা আমাদের চাইতেও বড় ও কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। এতদ্সত্ত্বেও তারা সবরের পরিচয় দিয়েছেন এবং মুসিবতকালে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিয়েছেন।

মুমিন যেন ভালো করে বুঝে নেয় যে, তার সবকিছুই তার জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই আশ্চর্যের। তার যাবতীয় কিছু তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। আর এটি শুধুই

মুমিনের বেলায়। যদি তার সুদিন আসে, তাহলে শোকরিয়া আদায় করে। সুতরাং এটি তার জন্য কল্যাণকর হলো। আর যদি কোনো বিপদ আসে, তাহলে সে সবর করে। সুতরাং এটিও তার জন্য কল্যাণকর হলো।[৩৫]

সকল মানবাত্মা তখনই কেবল প্রশান্তি ও সুখ উপলব্ধি করতে পারে, যখন সে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় নেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب

যারা ঈমান আনে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর জিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। শোনে রেখো, আল্লাহর জিকিরেই আত্মাসমূহ প্রশান্তি খুঁজে পায়। [সুরা রাদ, আয়াত : ২৮]

আর দুআ, ইসতিগফার, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াত—এগুলোর দ্বারাই আল্লাহর কাছে নিতে হয়। আমরা যেন তাদের মতো না হই, যারা দরিদ্রতার সময় কিংবা সন্তান অসুস্থ হলে অথবা পরীক্ষার সময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেয়। কিন্তু এসকল বিপদ দূরীভূত হয়ে গেলে সে আল্লাহর নিয়ামতের কথা ভুলে যায়। বিস্মৃত হয়ে যায় তিনি যে তার দুআ কবুল করেছেন সে কথাও। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে—

و إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون .

আর যখন মানুষকে কোনো দুর্দশা স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে। অতঃপর যখন আমি তার থেকে তুলে নেই তার সেই দুরবস্থা, তখন সে এমনভাবে চলে, যেন সে আমাকে এমন কোনো দুর্দশার জন্য কখনো ডাকেইনি, যা তাকে স্পর্শ করেছে। এভাবেই জালিমদের সামনে সেসকল কর্মকাণ্ড সুশোভিত করে তোলা হয়, যা তারা করতো। [সুরা ইউনুস, আয়াত : ১৩]

৯. সুখ প্রবৃত্তি দমনে

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তি দমন করবে এবং তার মনোবাসনাকে নিজের ওপর রাজত্ব করতে দেবে না, তাকেই বলা হবে বুদ্ধিমান ও আপন প্রবৃত্তির মালিক এবং সেই

[৩৫] হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন

সুখে থাকবে। ইহজগতেও, পরজগতেও। কোনো এক বাদশাহ সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি একবার জনৈক দুনিয়া বিমুখ আলিমের সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম দিলেন। দুনিয়াবিমুখ সেই আলিম সাদাসিধেভাবেই বাদশার সালামের উত্তর দিলেন। কিন্তু তাঁকে তেমন একটা গুরুত্ব দেননি। বাদশাহ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, আপনি আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না; অথচ আমি আপনার বাদশাহ?

দুনিয়াবিমুখ আলিম এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন। তিনি বাদশাকে বললেন, কীভাবে আপনি আমার বাদশাহ হবেন; অথচ আমার দাসেরা সবাই তো আপনার বাদশাহ? বাদশাহ বললেন, তারা কারা? আলিম বললেন, তারা হলো মনোবাসনা। এগুলোই আপনার বাদশাহ আর আমার গোলাম।

আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্মানিত কুরআনে প্রবৃত্তির নিন্দা করেছেন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণকে তার পূজা করা বলে গণ্য করেছেন। কারণ, প্রবৃত্তি যখন মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, তখন সে তার সময় খেয়ে ফেলে, তার চিন্তাজগৎকে ব্যস্ত করে রাখে এবং সে আল্লাহ ও তাঁর শরিয়তকে ভুলে গিয়ে প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য হালাল-হারাম উপেক্ষা করে কাজ করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا

আচ্ছা বলো তো, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, তুমি কি তার উকিল হবে? [সুরা ফুরকান, আয়াত : ৪৩]

১০. সুখ তাওবার মধ্যে

প্রত্যেক মুনিবই তার গোলাম থেকে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার রাখে এবং অধিকার রাখে তার অবাধ্যতা না পাওয়ার। যেরূপ প্রত্যেক সরকারই তার প্রজাদের ওপর এই অধিকার রাখে যে, তারা আইনকানুন মান্য করবে এবং তা অমান্য বা অন্যথা করবে না।

উমর ইবনু আবদুল আজিজের এক গোলাম কঠিন এক অপরাধ করে বসে। তাই তিনি গোলামকে বেত্রাঘাত করতে মাটিতে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন। এ সময় গোলাম বলল, হে আমার মুনিব, আপনি আমাকে কেন মারবেন?

উমর ইবনু আবদুল আজিজ বললেন, তুমি তো অমুক অপরাধ করেছ।

গোলাম বলল, আপনি কি কখনো এমন অপরাধ করেছেন, যার কারণে আপনার মুনিবও আপনার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ করেছি তো।

গোলাম বলল, আপনার মুনিব কি সে সময় আপনাকে শাস্তিদানে তাড়াহুড়ো করেছে?

তিনি বললেন, না।

গোলাম বলল, তাহলে আপনি কেন আমাকে শাস্তি দিতে তাড়াহুড়ো করছেন?

তিনি বললেন, দাঁড়াও। আজ থেকে তুমি স্বাধীন। গোলামের অপরাধটাই তার তাওবার কারণ হয়।

বিশর আল-হাফি একরাতে নিজ প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। তার গোলাম তার দরজায় পাহারা দিচ্ছিল। বিশর আল-হাফি গোনাহে ডুবে থাকতেন। একরাতে এক লোক তার দরজায় আগমন করল। সে গোলামকে বলল, এই প্রাসাদের সরদার কি স্বাধীন নাকি গোলাম? গোলাম উত্তরে বলল, আমার মুনিব বিশর স্বাধীন। আগন্তুক বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। তিনি যদি স্বাধীন না হয়ে গোলাম হতেন, তাহলে অবশ্যই গোলাম হওয়ার মর্যাদা রক্ষা করতেন এবং আল্লাহর অবাধ্যতা করতেন না।

বিশর এ কথা শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নগ্ন পায়ে বেরিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী বলেছ তুমি? লোকটি আগের কথাটাই পুনরায় তাকে বলল। তার মুখে এ কথা শুনে বিশর তাওবা করেন এবং আঁটঘাঁট বেঁধে ইলম অন্বেষণ, ইবাদত-বন্দেগি ও নেক আমলে লেগে পড়েন। জীবনভর তিনি নগ্নপদেই ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কেন জুতা পরিধান করেন না? তিনি বললেন, আমার রব আমাকে নেককার বানিয়েছেন নগ্নপদে থাকাবস্থায়। তাই আমি নগ্নপদেই থাকি।

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশা একদল লোককে তাওবা থেকে উদাসীন করে রাখে। এমনকি একসময় তারা তাওবা না করেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। তাদের একজন নাকি বলত, 'আমি আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখি।' আসলে লোকটি মিথ্যা বলেছে। যদি সে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখতোই, তাহলে অবশ্যই নেক আমল করতো।

১১. সুখ ইখলাস ও নিষ্ঠার মধ্যে

নিষ্ঠা ও লৌকিকতা বিপরীতমুখী দুটি বিষয়। এ দুটি বিষয় কখনো একসাথে যায় না। নিষ্ঠাবান ব্যক্তি আপন রবের প্রতি আস্থাশীল হয় এবং কথায় ও কাজে হয় সত্যবাদী। সে এটিও জানে যে, সৃষ্টিজগতের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান সত্তা আল্লাহ। এ কারণেই তার কাছে মানুষের প্রশংসা ও নিন্দা, উপকার ও ক্ষতি সবই বরাবর, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর আনুগত্য করে যায় এবং তাকে খুশি করে।

নিষ্ঠার একটি উদাহরণ হলো, মুসলিম বাহিনী একবার দীর্ঘ কয়েক মাসব্যাপী শক্তিশালী ও সুসংহত প্রাচীর বিশিষ্ট একটি শহর অবরোধ করে রাখে। অবরোধকালে এক রাতে কোনো এক সৈন্য কমান্ডারের কাছে এসে বলে, আমি প্রাচীরে এমন একটি ছিদ্র করেছি, যেখান দিয়ে আমরা শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারব এবং ভেতরে প্রবেশ করে দরজাও খুলতে পারব। সুতরাং এ ছিদ্র দিয়ে ভেতরে প্রবেশের জন্য আমার সাথে কিছু সেনা পাঠান। ভেতরে গিয়ে আমরা যখন দরজা খুলে দেবো, তখন পুরো বাহিনী শহরের ভেতরে ঢুকে পড়বে। কমান্ডার তার কথামতো তার সাথে কিছু সেনা পাঠালে তারা সকলেই সেই ছিদ্র দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো এবং দরজা খুলে দিলো। অতঃপর কমান্ডার শহরের ভেতরে ঢুকে গোটা শহরটি রাতের মধ্যেই দখল করে নেয়।

পরের দিন ঘোষক ঘোষণা করে বলল, প্রাচীর ছিদ্রকারীকে তার এই মহৎকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তার কোনো আবদার থাকলে তা-ও পূরণ করা হবে। কিন্তু তার ঘোষণা শুনে কেউ আসেনি। তৃতীয় দিনও ঘোষক ঘোষণা দিলো। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। চতুর্থ দিন এক সৈন্য কমান্ডারের কাছে এসে বলল, আমি আপনাকে প্রাচীর ছিদ্রকারী সেনার সন্ধান দেবো। কমান্ডার বললেন, বলো আমাকে, কোথায় সে? সে বলল, তিনটি শর্তে বলবো। কমান্ডার বললেন, তার শর্ত তিনটি মেনে নিলাম। বলো, শর্তগুলো কী?

সে বলল, প্রথম শর্ত হলো, তার এ কাজের জন্য তাকে কোনো পুরস্কার দিতে পারবেন না। দ্বিতীয় শর্ত হলো, তার কথা আর কাউকে অবহিত করতে পারবেন না। তৃতীয় শর্ত হলো, এবারের পর তাকে আর দ্বিতীয়বার ডাকতে পারবেন না।

কমান্ডার বললেন, ঠিক আছে, আমি শর্তগুলো মেনে নিলাম। এবার সৈন্যটি বলল, শহরের প্রাচীর ছিদ্রকারী লোকটি আমিই। আমি তা করেছি শুধুই আপন রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। এ কথা বলে সে চলে গেল। এদিকে কমান্ডার হতভম্ব হয়ে পড়লেন। এর পর থেকে কমান্ডার যখনই নামাজ পড়তেন, তখনই আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, তিনি যেন তাকে সেই প্রাচীর ছিদ্রকারী লোকটির সাথেই রাখেন।

১২. সুখ সততায়

সততা সকল মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মূল। যে এ গুণে নিজেকে সাজাতে পারে, তার গুণাবলিই পূর্ণতা লাভ করে এবং তার আখলাক হয় সমুন্নত। এমন লোকই সুখ লাভে ধন্য হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنت تجري من تحتهم الأنهار

এটি এমন দিন যেদিন সত্যবাদীদের সততা তাদের উপকার করবে। তাদের থাকবে এমন জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ১১৮]

এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ, জান্নাতে যাওয়া আমল কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সততা। বান্দা যখন সত্য বলে, তখন সে নেক কাজ করে। আর যখন নেক আমল করে তখন মুমিন হয়। আর যখন মুমিন হয়, তখন সে জান্নাতে যায়। লোকটি আবারো জিজ্ঞেস করলো, জাহান্নামের কাজ কী? তিনি বললেন, মিথ্যা। বান্দা যখন মিথ্যা বলল, তখন সে পাপ কাজ করলো। যখন পাপ কাজ করলো, তখন কাফির হয়ে গেল। আর যখন কাফির হয়ে গেল তখন জাহান্নামে প্রবেশ করলো।[৩৬]

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—সত্য বলে অপমানিত হওয়া আমার কাছে মিথ্যা বলে সম্মানিত হওয়ার চাইতে অধিক প্রিয়। যদিও সত্য বলে খুব কমই অপমানিত হয় আর মিথ্যা বলে খুব কমই সম্মানিত হওয়া যায়।

এক দার্শনিক বলেছেন—মিথ্যা সকল অনিষ্টের গোড়া এবং সর্বপ্রকার নিন্দার মূল। কারণ, মিথ্যা থেকেই চোগলখুরির জন্ম। আর চোগলখুরি থেকে জন্ম নেয় বিদ্বেষ। বিদ্বেষ পরিণত হয় শত্রুতায়। শত্রুতা যেখানে থাকে, সেখানে না থাকে কোনো নিরাপত্তা, আর না থাকে কোনো সুখ।

এক দেহাতি লোক তার ছেলেকে মিথ্যা কথা বলতে দেখে বলল, বাবা, মিথ্যুক আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির সম্মুখীন হয়। সে যদি সত্যও বলে, সেটা কারো কাছেই বিশ্বাসযোগ্য হয় না। কোনো কল্যাণের যদি ইচ্ছা করে, তার সেটা করার তাওফিক হয় না। তার সত্য কথা অন্যের বলে গণ্য করা হয়। আর অন্যের মিথ্যা কথা তার বলে গণ্য করা হয়।

কিছু লোক রসিকতার ছলে মিথ্যা বলাকে স্বাভাবিক মনে করে থাকে। তাদের ধারণা, হাসি-কৌতুকের ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু যেই ইসলাম বিনোদন হালাল করেছে, সেই ইসলাম বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ততটুকুরই অনুমোদন দিয়েছে, যতটুকু সততার ভিতরে থাকে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে, সে ধ্বংস হোক, সে ধ্বংস হোক, সে ধ্বংস হোক।[৩৭]

তিনি আরো বলেন—কোনো বান্দা পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে রসিকতা ও তর্কবিতর্কে মিথ্যা পরিহার না করে; যদিও সে সত্যবাদী হয়ে থাকে।[৩৮]

---

[৩৬] হাদিসটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বর্ণনা করেন।

[৩৭] হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহ. বর্ণনা করেছেন

১৩. সুখ হায়া ও লজ্জায়

যে সকল জিনিস বিবেকের কাছে অপছন্দ, রুচির কাছে উপেক্ষিত, সেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা এবং যেসব বস্তুর প্রতি সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিজীব পছন্দ করে না, সেগুলোকে ঘৃণা করার নাম হায়া বা লজ্জা। এটি এমনই এক মহৎ স্বভাব, যা মানুষকে হারাম ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান করে এবং তাকে গোনাহ ও পাপাচারে জড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করে। যার লজ্জা নেই, সে সবপ্রকার কল্যাণ ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

و من تزكى فإنما يتزكى لنفسه و إلى الله المصير

> আর যে পবিত্র হয়, সে তো নিজের কল্যাণের জন্যই পবিত্র হয়। আর সকলকে তো আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। [সুরা ফাতির, আয়াত : ১৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—লজ্জা ঈমানের অংশ। আর ঈমানের স্থান জান্নাতে। অশ্লীলতা জুলুমের অংশ। আর জুলুমের স্থান জাহান্নামে।[৩৯]

এক দার্শনিক বলেছেন—যে লজ্জার পোশাকে আবৃত, লোকজন তার দোষত্রুটি দেখতে পায় না।

আরেকজন বলেছেন—শিশুর মধ্যে ভয় থাকার চেয়ে লজ্জা থাকা শ্রেয়। কারণ, লজ্জা থাকা বুদ্ধির নিদর্শন। আর ভয় থাকা ভীরুতার আলামত।

১৪. সুখ সহনশীলতায়

ক্রোধ জেগে উঠলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাকে হিলম বা সহনশীলতা বলা হয়। অসংখ্য মানুষ আমরা দেখতে পাই, তারা অতি সাধারণ বিষয়ে ও তুচ্ছ কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং নিজের জীবন ও পরের জীবনকেও জাহান্নাম বানিয়ে দেয়। এসকল লোক যদি জানতো যে, সহনশীলতা শ্রেষ্ঠ আখলাক, এর মাধ্যমেই ব্যক্তির উন্নত স্বভাব পূর্ণতা লাভ করে, সহনশীলতাই মানুষকে আল্লাহর কাছে প্রিয় করে তোলে এবং মানুষের মর্যাদা সমুন্নত করে—তাহলে তারা গোস্বা করার কোনো রাস্তাই চিনত না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين

---

[৩৮] হাদিসটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বর্ণনা করেছেন।
[৩৯] হাদিসটি ইমাম আহমাদ ও তিরমিজি রহ. বর্ণনা করেন। তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

আপনি ক্ষমার নীতি গ্রহণ করুন এবং সৎকর্মের আদেশ দিন ও অজ্ঞদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। [সুরা আ'রাফ, আয়াত : ১৯৯]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—আমি কি তোমাদের এমন লোকদের কথা বলব না, যারা জাহান্নামের জন্য হারাম অথবা জাহান্নাম যাদের ওপর হারাম? প্রত্যেক সহজ-সরল-নম্র-সাধাসিধে লোকের জন্য জাহান্নাম হারাম।[৪০]

এক লোক ইমাম শাবি রাহিমাহুল্লাহকে মন্দ বলল। তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি যেমনটি বলেছ, আমি যদি তেমনই হই, তাহলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। আর যদি আমি এরূপ না হয়ে থাকি, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিন।

আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একবার তাঁর খাদেমের ওপর রাগান্বিত হলেন। রাগ চলে যাবার পর তিনি বললেন, তাকওয়া বড়ই কল্যাণকর। সে গোস্বাকারীকে হতভাগা হতে দেয় না।

জনৈক হাকিম বলেছেন—তুমি যদি জাহেলের কথার উত্তর না দাও, তাহলে একদিকে তুমি তাকে আরো অধিক কথা বলার সুযোগ দিলে। অপরদিকে ভীষণ যন্ত্রণাকর পরিস্থিতিতে ফেললে।

আরেক হাকিম বলেছেন—তুমি ক্ষিপ্ত না হয়ে ক্ষমাপ্রদর্শন করলে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই শান্তি দিলে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—আমি কি তোমাদেরকে সেই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করব না, যার কারণে আল্লাহ তোমার জান্নাতের প্রাসাদ সুউচ্চ করে দেবেন এবং তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলুল্লাহ। তিনি বললেন, যে তোমার সম্পর্কে অজ্ঞ, তার ব্যাপারে সহনশীলতা প্রদর্শন করো। যে তোমার ওপর জুলুম করে, তাকে ক্ষমা করে দাও। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তাকে দান করো। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো।[৪১]

১৫. সুখ তাওয়াজু ও বিনয় অবলম্বনে

বিনয় এমনই এক প্রশংসনীয় গুণ, যা মানুষের পরস্পরের মধ্যে মুহাব্বত ও ভালোবাসার জন্ম দেয় এবং তা পবিত্র আত্মা ও সুস্থ রুচির বহিঃপ্রকাশ। এ বিনয় অসংখ্য মানুষকে সুউচ্চে উঠিয়ে দিয়েছে। ফলে তারা হয়েছেন সফলকাম। বিপরীতে অহংকার বহু

---

[৪০] হাদিসটি ইমাম তিরমিজি ও ইবনে হিব্বান তার সহিহ ইবনে হিব্বান গ্রন্থে বর্ণনা করেন।
[৪১] হাদিসটি ইমাম তাবারানি রহ. বর্ণনা করেন।

মানুষকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে। ফলে রহমানের ক্রোধ তাদের ওপর আপতিত হয়েছে এবং তারা হয়েছে প্রকাশ্য ক্ষতিগ্রস্ত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما .

রহমানের বান্দা তো তারা, যারা জমিনে বিনয়ের সাথে চলে। আর যখন জাহেলরা তাদের কিছু বলে তখন তারা শুধু বলে সালাম। [সুরা ফুরকান, আয়াত : ৬৩]

তিনি আরো ইরশাদ করেন—

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض و لا فسادا و العاقبة للمتقين .

ওটাই পরকালের বাড়ি। আমি তা বানিয়ে রেখেছি তাদের জন্য, যারা পৃথিবীতে বড়াই করতে চায় না এবং চায় না ফাসাদ সৃষ্টি করতে। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্যই। [সুরা কাসাস, আয়াত : ৮৩]

১৬. সুখ পরিমিত ব্যয়ে

বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝামাঝি স্তরকেই পরিমিত ব্যয় বলে। এ পন্থা অবলম্বন করলে মানুষ তার চেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তির সাথে পাল্লা দিয়ে অপচয় ও বিলাসিতায় মেতে উঠবে না। অন্যথায় সে ঋণের শিকলে বন্দি হয়ে পড়বে এবং নিঃস্ব ফকির হয়ে যাবে। ফলে যেই তাকে দেখবে তার কাছেই সে উপেক্ষিত হবে। আবার নিজের জন্য ও পরিবারের জন্য খরচ করতে কার্পণ্য করবে না এবং অসহায় ও অভাবীদের ওপর অনুগ্রহ করতে কৃপণতা দেখাবে না। অন্যথায় সে তাদের লোভের ক্ষতিকর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে এবং অশান্তিতে জীবন কাটাতে হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا .

> আর তুমি তোমার হাত নিজ ঘাড়ের সাথে বেড়ি দিয়ে আটকে রেখো না এবং সম্পূর্ণ প্রসারিত করে দেবে না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে। [সুরা ইসরা, আয়াত : ২৯]

সাঈদ ইবনু জুবায়ের বলেন—ভালো বস্তু খারাপ স্থানে খরচ করাও বাড়াবাড়ি।

ইবনু জিয়াদকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি দিরহাম কেন ভালোবাসেন অথচ দিরহাম তো আপনাকে দুনিয়ার নিকটবর্তী করে দিচ্ছে? তিনি বললেন—দিরহাম যদিও আমাকে দুনিয়ার নিকটবর্তী করে দিচ্ছে; কিন্তু আমাকে দুনিয়া থেকে অমুখাপেক্ষী বানাচ্ছে।

১৭. সুখ ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতায়

ইনসাফ বলা হয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্য ও সঠিক পথটি আঁকড়ে ধরা এবং জুলুম থেকে দূরে থাকা কিংবা ইনসাফের পথ থেকে সরে যাওয়া। জুলুম অত্যন্ত বিপদসংকুল পথ। এ পথের পথিক খুব কমই এর থেকে মুক্তি পায়। জালিমের অপরাধ যে কত বড়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, মানুষ জালিমকে বয়কট করে এবং তার ওপর দয়াময় আল্লাহর গজব আপতিত হয়। যারা জালিম, তারা আত্মিক প্রশান্তির মর্ম বুঝে না এবং সুখের কোনো অস্তিত্ব আছে কি না, তা-ও জানে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

> و لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.

> আর তুমি আল্লাহকে জালিমদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উদাসী মনে করো না। তিনি তো তাদেরকে শাস্তিদানে বিলম্বিত করছেন এমন একদিনের জন্য, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হয়ে থাকবে। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—তোমরা মজলুমের বদদুআ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, তার দুআ সাদা মেঘ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার মর্যাদা ও বড়ত্বের কসম, অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করবো, যদিও কিছুকাল পরে হয়।[৪২]

---

[৪২] হাদিসটি ইমাম তাবারানি রহ. বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরো বলেন—তোমাদের যে কেউ যদি এই উম্মতের কোনো দায়িত্বে থাকে, চাই তা ছোট হোক বা বড়, কিন্তু তাদের ব্যাপারে ইনসাফ না করে তাকে আল্লাহ উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[৪৩]

উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এক গভর্নরের কাছে এই মর্মে চিঠি লিখে পাঠান যে, তোমার ক্ষমতা যদি তোমাকে মানুষের ওপর জুলুম করতে বলে, তাহলে তুমি তোমার ওপর তোমার রবের ক্ষমতার কথা স্মরণ করো।

১৮. সুখ আপন সন্তানের জন্য দুটি জিনিস নিশ্চিত করার মধ্যে

বাবার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য দুটি বিষয় দান করেছেন। প্রথমটি হলো আল্লাহর ভয়। দ্বিতীয়টি হলো সত্য কথা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله و ليقولوا قولا سديدا .

> যারা নিজেদের মৃত্যুর পর দুর্বল সন্তানাদি রেখে গেলে তাদের ব্যাপারে শঙ্কা বোধ করে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সত্য কথা বলে। [সুরা নিসা, আয়াত : ৯]

খলিফায়ে রাশিদ উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুকালে আটজন সন্তান রেখে যান। মুমূর্ষু অবস্থায় লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করে, হে উমর, আপনি আপনার সন্তানদের জন্য কী রেখে গেছেন? তিনি বললেন, আমি তাদের জন্য তাকওয়া রেখে গেলাম। তারা যদি নেককার হয়, তাহলে আল্লাহই নেককারদের দায়িত্ব নেবেন। আর যদি তারা এর বিপরীত হয়, তাহলে আমি তাদের জন্য এমন কিছু রেখে যেতে চাই না, যা তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানি করতে সহায়তা করবে।

তো উমর তাঁর প্রত্যেক ছেলের জন্য রেখে গেছেন মাত্র ১২ দিরহাম করে। আর খলিফা হিশাম ইবনু আবদুল মালিক তার প্রত্যেক ছেলের জন্য রেখে যান ১ লক্ষ দিনার করে। কিন্তু ২০ বছর পর দেখা গেল, উমর ইবনু আবদুল আজিজের ছেলেরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য ঘোড়ায় জিন বাঁধছে এবং তারা তাদের বিপুল সম্পদ থেকে দান-সদকা করছে। বিপরীতে হিশামের ছেলেরা খলিফা আবু জাফর মানসুরের শাসনামলে

[৪৩] হাদিসটি ইমাম হাকেম রহ. বর্ণনা করে সহিহ বলেছেন।

দারুস সালাম মসজিদের সামনে বসতো আর আল্লাহর বান্দাদের কাছে আল্লাহর সম্পদ চাইত অর্থাৎ ভিক্ষা করতো।

১৯. নারীর সুখ কি মেকআপে?

এক দেহাতি নারী। বয়সে প্রবীণ হলেও তিনি তার যৌবন ও রূপসৌন্দর্য এখনো ধরে রেখেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কোন ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করেন এবং সেগুলো কোথা থেকে আনেন?

সেই মহিলা উত্তরে বলেন—আমি আমার ঠোঁটের জন্য ব্যবহার করি সত্য কথা; যদিও তা তিক্ত হয়। কণ্ঠস্বর ঠিক রাখার জন্য নামাজ পড়ি এবং কুরআন তিলাওয়াত ও তাসবিহ পাঠ করি। চোখের জন্য ব্যবহার করি দয়া-অনুগ্রহ ও মায়া-মমতা এবং দৃষ্টি অবনত রাখি। হাত ঠিক রাখার জন্য যথাসাধ্য ইহসান করি। অন্তরের জন্য আল্লাহর ভালোবাসা লালন করি। স্বামী আমার দিকে তাকালে তাকে সুখী করে তুলি। যখন আমাকে আদেশ করেন আমি তার আনুগত্য করি। তবে আল্লাহর নাফরমানি হয় এমন বিষয়ে তার আনুগত্য করি না।

আর যখন তিনি আমার থেকে অনুপস্থিত থাকেন, তখন তার জন্য তার সম্পদ এবং আমার নিজেকে হেফাজত করি। এবং আল্লাহর মোরাকাবার মাধ্যমে আমার সুখ ষোলকলায় পূর্ণ হয়।

আমি জানি, কোনটা আমার রবের হক আর কোনটা স্বামীর হক। সেই হিসেবে আমি প্রত্যেকের হক আদায় করি।[৪৪]

[৪৪] অধ্যাপক আবদুর রহমান সানজারি রচিত ইয়া ইবনাতিয়াল হাবিবাহ, হাজা হুওয়াত তরিক ইলাল জান্নাহ গ্রন্থ।

তৃতীয় অধ্যায়

অন্যদের যেভাবে সুখী করবেন

কিছু মানুষ আছেন, যারা সৃষ্টির অপার সৌন্দর্যের মাঝে সুখ দেখতে পান। সুতরাং নয়নাভিরাম দৃশ্য, সুচিন্তা, রসাত্মক গান ও আনন্দঘন সাক্ষাৎ—এ সবকিছুই সুখ ও সৌভাগ্য লাভের উপকরণ। কিন্তু অপরকে সুখী করতে পারা মহৎ লোকদের কাছে সর্বাধিক প্রিয় ও উপভোগ্য বিষয়; যদিও তা ভাব বিনিময় ও সমবেদনা জানানোর মাধ্যমে হয়ে থাকে। এঁদের কাছে অন্যদের চেহারায় সুখের দৃশ্য অবলোকন করার চাইতে অধিকতর পছন্দনীয় আর কিছু হতে পারে না।

আবার কিছু মানুষকে দেখা যায়, তারা আপন স্ত্রী ও সন্তানদের সুখে রাখার মধ্যেই সুখ অনুভব করেন। তাদের সবচেয়ে বড় আনন্দ ও খুশির বিষয় হলো, নিজের পরিবারের দেখভাল করা। সকল স্বাদ তারা এতেই উপভোগ করে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে এবং প্রিয়জনদের সুখী করার মাধ্যমে সে নিজেকেও সুখী করে তোলে।

অপরকে সুখী করলে কিংবা অপরের সুখ নিরবচ্ছিন্ন করতে তাদের জন্য কুরবান হয়ে যাওয়ার মাধ্যমেও কখনো সুখ লাভ হয়, বিশেষত যদি আমরা প্রকৃত অর্থেই তাদের ভালোবেসে থাকি।

মানবজীবন এমনই এক আমল, যার থেকে হয়তো তুমি উপকৃত হবে কিংবা অন্যরা উপকৃত হবে। সুতরাং তুমি যদি অপরের উপকার করো, তাহলে দুনিয়াতেও সুখ পাবে। পরকালেও পাবে। আর যদি শুধুই নিজের উপকার করো, তাহলে শুধু সেই মুহূর্তটাতেই তুমি সুখানুভূতি লাভ করবে।

ভলতেয়ার বলেন—যে কোনো মানুষের সুখের কারণ হয়, তার জীবনেই সুখ ধরা দেয়।

এমারসন বলেন—সুখ এমনই এক সুগন্ধি, যা তুমি অন্যের গায়ে মাখতে গেলে তার বহু ছিটা অবধারিতভাবে তোমার গায়েও এসে পড়বে।

আল্লাহ তাআলা তো সেই ব্যক্তিকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন, যিনি একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছেন। তাহলে তিনি সেই ব্যক্তির সাথে কেমন আচরণ করবেন, যে নিজের মানব-ভাইয়ের অনুভূতি উপলব্ধি করে তার তৃষ্ণা নিবারণ করেন? নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের থেকে দুনিয়ার কোনো বিপদ দূরীভূত করবে, আল্লাহ তাআলা তার থেকে কিয়ামত দিবসের বিপদ দূরীভূত করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবীর বোঝা হালকা করে দেবে, আল্লাহ তাআলা ইহকাল ও পরকালে তার বোঝা হালকা করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকবে, আলাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত সেই বান্দার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।[৪৫]

১. হাসিখুশি থাকা অপরকে সুখী করার মাধ্যম

মানুষের অন্তরে সুখ পৌঁছানোর অন্যতম কার্যকরী একটি মাধ্যম হলো, হৃদয়ের গহীন থেকে উৎসারিত লৌকিকতামুক্ত হাসি। এরূপ হাসি মানুষের আত্মাকে পুলকিত করে তোলে।

আর কৃত্রিম হাসি মানুষের অন্তরে পৌঁছুতে পারে না। কিংবা বলা যায়, তারা এমন হাসি গ্রহণ করে না। কৃত্রিম হাসি কপটতার প্রকাশ্য একটি রূপ। এমন হাসি সৃষ্টি হয় মূলত অন্যদের ব্যাপারে তার এই ধারণা থেকে যে, তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী মানুষের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে। আর এ কারণেই সে তাদের মনোতুষ্টির জন্য এমন হাসি হেসে তাদের তোষামোদ করে, যেই হাসিতে লুকিয়ে থাকে হাসির বিপরীত অবস্থা। বড়ই আফসোসের বিষয় হলো, এরূপ কপট হাসিরই প্রচলন আজকাল খুব বেশি।

সুতরাং হে লোকসকল, আপনারা আপনাদের ঠোঁটের প্রতি সদয় হোন! আমাদের উচিত, আমাদের ঠোঁটগুলোকে সর্বপ্রকার কপটতা থেকে পবিত্র রাখা এবং আমাদের ঠোঁটগুলো যেন হয় এমন স্বচ্ছ ও পবিত্র হাসি বিতরণের মাধ্যম, যা আমাদের আশপাশের লোকজনের মাঝে সুখ ছড়িয়ে দেবে।

অপরের আচরণে আপনি যখন আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকবেন, তখন আপনার দ্বারাই সৃষ্টি হবে সুখময় ও আনন্দঘন এক পরিবেশ। সুতরাং অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করুন প্রফুল্লচিত্তে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে দিন খুশি ও আনন্দধারা। নিজের জীবনের জন্যই সর্বদা সহাস্যবদনে থাকুন। কারণ, সহাস্যবদন সুখের সৃষ্টি করবে আপনার অন্তরে এবং অন্যদের হৃদয়জগতেও। আমরা তো সাধারণত আকৃষ্ট হই এমন লোকের প্রতি, যারা হাসিখুশি

[৪৫] হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন।

থাকে। আর যারা ভ্রূকুটি করে রাখে এবং থাকে ক্রোধান্বিত, তাদের আমরা পছন্দ করি না। সুতরাং আপনি হাসিখুশি থাকুন। তাহলে মানুষের ভালোবাসা ও ভক্তি লাভ করবেন।

নারীর সৌন্দর্যের কীইবা মূল্য থাকে, যদি সে মুখ বাঁকা করে রাখে এবং ক্ষিপ্ত হয়ে আপন ঘরকে নরকে পরিণত করে?

আপনি হাসিমুখে থাকুন এবং আপনার ডানে-বামে সকলের মাঝে এই হাসি ছড়িয়ে দিন। সর্বদা হাসিমুখে থাকলে কোনো কিছুই আপনি হারাবেন না। বরং তা আপনার হৃদয়কে করবে প্রফুল্ল এবং আপনার প্রিয়জনদের অন্তরকে করবে পুলকিত।

আবদুল্লাহ ইবনু হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে অধিক হাসিখুশি আর কাউকে দেখিনি।[৪৬]

২. সুখ চারিত্রিক সৌন্দর্যে

যার আচার-ব্যবহার ও চরিত্র সুন্দর হয়, সে আপন স্ত্রী, সন্তানাদি, সময়বসী ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে প্রিয়ভাজন হয় এবং মানুষের কাছে হয় সম্মানিত।

পক্ষান্তরে রূঢ় প্রকৃতির ও দুশ্চরিত্রের মানুষ; যে কাউকে ভালোবাসে না এবং কারো ভালোবাসাও পায় না, যাকে তাঁর স্ত্রীই অপছন্দ করে, নিজের পরিচারিকাই যাকে ঘৃণা করে, আপন সন্তানই যাকে অবজ্ঞা করে এবং যার প্রতি তার পরিবার ও প্রতিবেশীরা বিরক্ত—এরূপ লোক শারীরিকভাবে যতই সুস্থ থাকুক এবং তার যতই অঢেল অর্থকড়ি থাকুক, সে কস্মিনকালেও সুখী হতে পারবে না। বরং সে হয় অন্যতম বড় অসুখী ও চরম দুঃখী।

মানুষের সাথে অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতার নীতি হলো, হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্ল থাকা এবং উত্তম চরিত্র ও শিষ্টাচার বজায় রাখা। হজরত জাবের ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সকল ভালো কিছুই সদকা। আপন ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করা এবং আপন ভাইয়ের পাত্রে নিজের বালতি থেকে পানি ঢেলে দেওয়াও ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত।[৪৭]

---

[৪৬] হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহ. বর্ণনা করেছেন।
[৪৭] ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদিসটি হাসান।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনের গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেন—মুমিন ভালোবাসে। সে ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই নিজেও ভালোবাসে না এবং অন্য কারো ভালোবাসাও পায় না।[৪৮]

হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—বন্ধু ও প্রিয়জনদের সাক্ষাতে দুঃখ ও পেরেশানির অবসান ঘটে।

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ছেলেকে লক্ষ করে বলেন—অপরিচিত তো সেই, যার কোনো বন্ধু নেই। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন— যার পেরেশানি বেশি, তার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। যার চরিত্র খারাপ হয়ে যায়, সে যেন নিজের আত্মাকে পীড়া দেয়। যে মানুষের সাথে ঝগড়া বাধায়, তার ব্যক্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যায় এবং তার সম্মান শেষ হয়ে যায়। বান্দার সর্বোত্তম ঈমান হলো এই বিশ্বাস রাখা যে, সে যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তার সাথেই থাকেন।

৩. দ্বীন যেখানে পারস্পরিক সম্পর্ক

যে ব্যক্তি নিজের প্রতিবেশীর ওপর মিথ্যা অভিযোগ দেবে, তার ব্যাপারে শরিয়তে রয়েছে কঠোর বিধান। এরূপ ব্যক্তির ব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—আল্লাহর কসম সে মুমিন হবে না, আল্লাহর কসম সে মুমিন হবে না, আল্লাহর কসম সে মুমিন হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কে সেই ব্যক্তি ইয়া রাসুলাল্লাহ? উত্তরে তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।[৪৯]

তাছাড়া কিছু মুসলমান তো কাঙ্ক্ষিত ইবাদতসমূহ আদায় করে এবং সেসব ইবাদত প্রতিষ্ঠা করার বিপুল আগ্রহ নিয়ে তারা জনসমাজে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু একই সাথে তারাই এমন কিছু কাজে জড়িয়ে পড়ে, যেগুলো উন্নত চরিত্র ও সত্য ঈমানের সাথে যায় না।

এ ব্যাপারেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! অমুক মহিলার ব্যাপারে আলোচনা-কালে বলা হয়— সে বেশি বেশি নামাজ পড়তো, অধিক পরিমাণে রোজা রাখতো এবং দান-সদকাও করতো বিপুল। তবে সে নিজের প্রতিবেশীকে জবান দিয়ে কষ্ট দিত। এটি শুনে তিনি বললেন, সেই মহিলা জাহান্নামে যাবে। অতঃপর লোকটি আবারো বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! অমুক

---

[৪৮] হাদিসটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বর্ণনা করেছেন।

[৪৯] ইমাম বুখারি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

মহিলার ব্যাপারে বলা হয়, সে নামাজ-রোজা কম আদায় করতো এবং দান করতো সামান্য কয়েক টুকরো পনির। তিনি বললেন, সে জান্নাতে যাবে।[৫০]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদের বলে দিবো না, কিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে আমার কাছে কে সর্বাধিক প্রিয় হবে এবং আমার অধিকতর নিকটে বসবে? তিনি এ কথাটি দুই কিবা তিনবার বলেছেন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, জি, ইয়া রাসুলুল্লাহ। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।[৫১]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলে দিতে চান যে, মনের স্বচ্ছতা ও জীবনের স্বচ্ছতা আর চারিত্রিক সৌন্দর্য ও জীবনের সৌন্দর্যের মাঝে সুদৃঢ় ও গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং তিনি আমাদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন, তার ব্যাপক বরকত মুমিনদের ওপর অবতীর্ণ হয় শান্তি ও নিরাপত্তা হয়ে আর মুত্তাকি ও সৎকর্মশীলদের ওপর অবতীর্ণ হয় পুণ্য ও অনুগ্রহ হয়ে। তাই তো তিনি ইরশাদ করেন—

> و لو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض.
>
> যদি গ্রামবাসী ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান এবং জমিনের বরকতের ধারা উন্মুক্ত করে দিতাম। [সুরা আরাফ, আয়াত : ৯৬]

৩. সৎকর্ম মন্দকর্মকে মুছে দেয়

উপর্যুক্ত বাক্যটি আল্লাহর কিতাবের সুমহান একটি আয়াত। এই আয়াতটি দ্বীন ও দুনিয়া সংক্রান্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রে কতই না চমৎকার এক আলোকবর্তিকা! কারণ, বহু মানুষের জীবনের ভুলগুলো তাদের জন্য পেরেকতুল্য, যা তাদের পা-কে করে রক্তাক্ত, তাদের সুখকে করে দেয় মলিন এবং তাদের অগ্রযাত্রাকে দেয় থামিয়ে।

আমাদের মধ্যে কার ভুল হয় না, কার পদস্খলন হয় না এবং কেইবা গুনাহ করে না! কিন্তু মানুষ যদি মন্দের পরে কোনো নেক কাজ করে, তাহলে সেই নেক কাজ আল্লাহর আদেশে মন্দ কর্মকে মোছন করে দেয়। আমাদের সামাজিক জীবনে আল্লাহর এই সুমহান

---

[৫০] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।
[৫১] হাদিসটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বর্ণনা করেছেন।

নীতি ও আদর্শ জীবিত করা বড়ই প্রয়োজন। কারণ, আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ তো আছে, যারা প্রতিদিন অন্যের সাথে দুর্ব্যবহার করে; সহপাঠীর সাথে রূঢ় আচরণ করে, কিংবা স্বামীর ওপর রাগান্বিত হয়, অথবা বন্ধুর ওপর জুলুম করে, বা সন্তানের ওপর কঠোরতা করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে কিংবা কোনো প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়—এ জাতীয় আরও নানা মন্দ কাজ করে থাকে। ফলে কখনো মেজাজ বিগড়ে যায়। কখনো শিরা-উপশিরা ছেড়ে দেয়। আবার কখনো ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং শয়তান জয়ী হয়ে যায়। অথবা হঠাৎ মুখ ফসকে যায় কিংবা অন্য কোনো কারণে মন সংকীর্ণ হয়ে যায়। তখন সে বিরক্ত ও অস্থির থাকার কারণে প্রিয়জনের সাথে অনুপযুক্ত আচরণ করে বসে।

জীবনচলার পথে এসব কিছু নিঃসন্দেহে ঘটতে পারে। কিন্তু এসবের মহৌষধও রয়েছে। এবং তা হলো—মন্দের পর ভালো কাজ করে ফেলা। এতে আপনার পাপ মুছে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি ভালো কথা বলবেন, চেহারায় হাসি ফোটাবেন, নিখাদ ভালোবাসা প্রদর্শন করবেন, খুশি থাকবেন, দান-দক্ষিণা করবেন, বাস্তব প্রশংসা করবেন, অন্তর থেকে ওজর পেশ করবেন, অন্যদের বেলায় ওজর তালাশ করবেন। কারণ, তারাও তো আমাদের মতোই মানুষ। আমাদের মতো তারাও ভুলের শিকার হন। তাদের ওপর দিয়েও এমনসব পরিস্থিতি অতিক্রম করে যেগুলো তাদেরকে করে তোলে অশান্ত ও অস্থির; অথচ আমরা তা জানি না। বড় বুদ্ধিমান সেই, যে মানুষের ওজর-আপত্তি অধিক গ্রহণ করে। এরূপ ব্যক্তিই আপন জীবনে সুখ অনুভব করে এবং অসম্ভব জিনিস অর্জনের নেশায় নিজেকে ধ্বংস করে দেয় না।

আপনি যদি ভুল করেন, তাহলে আপনার আত্মা যেন আক্ষেপ করতে করতে শেষ না হয়ে যায়। বরং এতটুকু লজ্জিত হোন, যার দরুন আপনি ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কখনো 'যদি' বলবেন না। কেননা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষ্য অনুযায়ী 'যদি' শব্দটি শয়তানি কর্মকাণ্ডের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

মন্দের পরপর পুণ্যের কাজ করুন। তাহলে আপনার ভুল মুছে যাবে এবং আল্লাহর আদেশে আপনি নিজের সামনে সুখ দেখতে পাবেন।[৫২] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় করো। পাপের পর পুণ্যের কাজ করো। ফলে তা পাপকে মোছন করে দেবে। মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো।[৫৩]

---

[৫২] আবদুল্লাহ আল-জুআইসিন রচিত তাজারিবুহুম মাআস্ সাআদাহ
[৫৩] হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহ. বর্ণনা করেছেন

৫. পিতামাতাকে সুখে রাখুন

এমন কোনো মানুষ নেই, যে পিতামাতার খাঁটি বন্ধুত্ব ও বিপুল অবদান অনুভব করে না। তাদের দুজনের কারণেই তো এই জীবনে সে অস্তিত্ব লাভ করতে পেরেছে। তারা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে লালনপালন করেছে এবং বার্ধক্য পর্যন্ত তাদের শান্তি ও আরামের লক্ষ্যে কাজ করে গেছে। সুতরাং এখন তার করণীয় হলো, ঠিক সেভাবে তাদের আদরযত্ন করা, যেরূপ তারা তার ক্ষেত্রে করেছে এবং তাদের সঙ্গে সদাচার করা, যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাকে করতে আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেন—

و قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولا كريما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

> তোমার রব আদেশ করেছেন, তোমরা শুধুই তার ইবাদত করো এবং পিতামাতার প্রতি ইহসান করো। তাদের কোনো একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তুমি তাদের উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। বরং তাদের তুমি সম্মানজনক কথা বলো। তাদের প্রতি তুমি রহমতের ডানা মেলে দাও এবং বলো, হে আমার রব, আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন সেইভাবে, যেভাবে (দয়া প্রদর্শন করে) তারা আমাকে শিশু অবস্থায় লালন-পালন করেছেন। [সুরা ইসরা, আয়াত : ২৩-২৪]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—তোমরা তোমাদের পিতামাতার সাথে সদাচার করো। তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে।[৫৪] তিনি আরো বলেন—যে ব্যক্তি পিতামাতার সাথে সদাচার করে, তার জন্য রয়েছে সুসংবাদ। এরূপ ব্যক্তির হায়াত আল্লাহ তাআলা বৃদ্ধি করে দেন।[৫৫]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি নিজের মাকে কাঁধে তুলে কাবাঘরের তাওয়াফ করছে। লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করল, হে ইবনু উমর আমি কি তার প্রতিদান দিতে পেরেছি? তিনি বললেন, না। একটি নিশ্বাসেরও না। তবে তুমি

[৫৪] হাদিসটি ইমাম তাবারানি রহ. ভালো সনদে বর্ণনা করেছেন।
[৫৫] হাদিসটি ইমাম তাবারানি ও ইমাম হাকেম রহ. বর্ণনা করেছেন। হাকেম রহ. হাদিসের সনদটিকে সহিহ বলেছেন।

ভালো কাজ করেছ। আর আল্লাহ তোমাকে এই সামান্য আমলের কারণে অনেক সাওয়াব দিতে পারেন।

৬. নিজের আত্মীয়দের সুখী করুন

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আত্মীয়দের মধ্যকার ভালোবাসার রজ্জু সুদৃঢ় করার এবং আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতা জোরদার করার সবচেয়ে কার্যকরী ও শক্তিশালী মাধ্যম হলো আত্মীয়তা রক্ষা করা। যে এ সম্পর্ক ছিন্ন করার দুঃসাহস করে এবং আত্মীয়তা রক্ষা না করে, সে যেন ঐশী নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিল। সুতরাং এরূপ ব্যক্তি নিজের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে কোনো বন্ধু পাবে না। পাবে না কোনো সাহায্যকারীও। মহান আল্লাহ বলেন—

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا .

হে মানুষ সকল! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি আত্মা থেকে এবং সেই আত্মা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী এবং তাদের উভয় থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নারী ও পুরুষ। তোমরা ভয় করো সেই আল্লাহকে, যার সম্পর্কে এবং আত্মীয়তার ব্যাপারে তোমরা পরস্পর জিজ্ঞেস করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। [সুরা নিসা, আয়াত : ১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—যে ব্যক্তি চায় তার রিজিক প্রশস্ত করে দেওয়া হোক এবং তার হায়াত বাড়িয়ে দেওয়া হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।[৫৬] অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন—আত্মীয়তা রক্ষা করা, উত্তম আচরণ প্রদর্শন করা এবং প্রতিবেশীর সাথে সদাচার করা—এগুলোর দ্বারা ঘরসমূহ আবাদ হয় এবং হায়াত বৃদ্ধি পায়।[৫৭]

৭. সুখ মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার মাঝে

আপনি যদি কোনো মানুষকে আপনার প্রতি প্রয়োজনগ্রস্ত দেখেন, তাহলে প্রথমেই আপনি আল্লাহর প্রশংসা করুন এই কারণে যে, তিনি আপনাকে এই দায়িত্বের উপযুক্ত করেছেন। দ্বিতীয়বার আল্লাহর প্রশংসা করুন এই কারণে যে, তিনি আপনাকে মানুষের

[৫৬] হাদিসটি ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনা করেছেন।
[৫৭] হাদিসটি ইমাম আহমাদ ও বাইহাকি রহ. বর্ণনা করেছেন।

প্রয়োজন পুরা করার তাওফিক দিয়েছেন। কেননা, আপন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পুরা করার জন্য হাঁটা মসজিদে ইতিকাফ করার চেয়ে অধিক উত্তম। কোনো মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে কিংবা তার কোনো কাজ সমাধা করতে তাকে সাহায্য করে তার অন্তরে পুলক সৃষ্টির চেয়ে অধিক দারুণ সুখ আর কী হতে পারে!

এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আলাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় বান্দা কে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর দরবারে সেই সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি, যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো, কোনো মুসলিমের অন্তরে আনন্দ দান করা; তার থেকে কোনো বিপদ দূর করা কিংবা তার কোনো ঋণ পরিশোধ করা অথবা তার ক্ষুধা নিবারণ করা। কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পুরা করার জন্য তার সাথে হাঁটা এই মসজিদে—মসজিদে নববি—এক মাস ইতিকাফ করার চেয়ে আমার অধিক প্রিয়। যে ক্রোধ দূর করে, আল্লাহ তার গোপন বিষয় ঢেকে রাখেন। আর যে নিজের গোস্বা নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু তা জারি রাখতে চাইলে জারি রাখতে পারত, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার অন্তর আনন্দে ভরে দেবেন। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোনো প্রয়োজন পুরা হওয়া পর্যন্ত তার সাথে চলল, আল্লাহ সেদিন তার পা অবিচল রাখবেন যেদিন সকল পা পিছলে যাবে।[৫৮]

তিনি আরো বলেন—কিছু মানুষের কাছে আল্লাহর কতগুলো নিয়ামত আছে। এ সকল নিয়ামত তিনি তাদের কাছেই বহাল রাখেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিভক্তিহীনভাবে মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণে লেগে থাকে। তারা বিরক্তিবোধ করলে তিনি নিয়ামতসমূহ অন্যদের কাছে নিয়ে যান।[৫৯]

আল্লাহর জন্য বন্ধুত্বের একটি আলামত হলো, আপনি আপনার ভাইয়ের উপকার করতে পছন্দ করবেন এবং উপকার তার কাছে পৌঁছার কারণে খুশিতে আপনার মনটা ভরে যাবে। যেমন আপনার কাছে কোনো উপকার পৌঁছলে আপনি খুশি হন। কষ্ট করে আপনি যদি এই গুণটি লাভ করতে পারেন, তাহলে তো আপনি সবচেয়ে পবিত্র ও সাওয়াবপূর্ণ ইবাদত নিয়ে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হয়ে যাবেন।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, একবার তিনি মসজিদে নববিতে ইতিকাফ করছিলেন। তাঁর কাছে এক লোক এসে সালাম দিলো। অতঃপর বসে পড়লো। ইবনু আব্বাস তাকে বললেন, তোমাকে চিন্তিত ও পেরেশান মনে হচ্ছে! লোকটি বলল, আপনি ঠিকই ধরতে পেরেছেন হে রাসুলের চাচাতো ভাই। আমার ওপর

[৫৮] আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব : ১/৪৭৫
[৫৯] হাদিসটি ইমাম তাবারানি রহ. বর্ণনা করেছেন।

অমুকের বন্ধুত্বের হক রয়েছে। কিন্তু এ কবরের বাসিন্দার দোহাই দিয়ে বলছি, আমি তা আদায় করতে সক্ষম নই।

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি কি তোমার ব্যাপারে লোকটির সাথে কথা বলব? সে বলল, আপনার ইচ্ছা। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু পায়ে জুতো পরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন। তৎক্ষনাৎ লোকটি ইবনু আব্বাসকে বলল, আপনি যে ইতিকাফে আছেন, তা কি আপনি ভুলে গেছেন? তিনি বললেন, না ভুলিনি। কিন্তু এই কবরবাসী যিনি পরপারে পাড়ি দিয়েছেন বেশিদিন হয়নি, তাকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে হাঁটে এবং এ প্রয়োজন পুরা করে দেয়, তার এই কাজ দশ বছর ইতিকাফ করার চেয়ে উত্তম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন ইতিকাফ করবে আল্লাহ তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে এমন তিনটি গর্ত সৃষ্টি করে দেবেন যেগুলো আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী জায়গার চেয়েও অধিক বড় হবে। অন্য বর্ণনায় আছে, প্রতিটি গর্ত হবে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী জায়গার চেয়েও বিশাল বড়।[৬০]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ইতিকাফ ছেড়ে দেওয়াকে প্রাধান্য দিলেন। অথচ ইতিকাফ এমন এক ইবাদত, যার রয়েছে আল্লাহর কাছে সুউচ্চ মর্যাদা। কারণ, ইতিকাফ মানে পূর্ণ সময় নামাজ-রোজা ও জিকিরে ডুবে থাকা। এই ইতিকাফ মসজিদে নববিতে হলে অন্য মসজিদের তুলনা হাজার গুণ সাওয়াব বেড়ে যায়।

এতদ্‌সত্ত্বেও ইবনু আব্বাসের ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান তাকে ইতিকাফ ছেড়ে সাহায্যপ্রার্থী এক মুসলিমের সেবায় এগিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এভাবেই তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন।[৬১]

৮. সুখ হাদিয়া আদান-প্রদানের মধ্যে

যাকে হাদিয়া দেওয়া হয়, হাদিয়া তার মধ্যে জাদুর মতো কাজ করে এবং তা মানুষের মাঝে ভালোবাসা, মহব্বত ও আন্তরিকতা ছড়িয়ে দেয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—তোমরা একে অপরকে হাদিয়া দাও। তাহলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। কারণ, হাদিয়া ভালোবাসা সৃষ্টি করে এবং শত্রুতা দূর করে।[৬২]

প্রবাদ আছে, যখন তুমি সফর থেকে ফিরে আসো, তখন তোমার পরিবারকে হাদিয়া দাও। যদিও তা একটি পাথর হয়।

[৬০] হাদিসটি ইমাম তাবারানি রহ. বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকেম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, হাদিসের সনদ সহিহ।
[৬১] শাইখ মুহাম্মদ গাজালি রচিত খুলুকুল মুসলিম।
[৬২] হাদিসটি ইমাম মালেক রহ. বর্ণনা করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈবাহিক সুখ

সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা নেই, যা সৌন্দর্য ও শান্তির দিক দিয়ে সুখী ঘরের সমতুল্য হতে পারে। যেখানেই আমরা সফর করেছি এবং যেকোনো স্থানেই আমরা অবতরণ করেছি, কোথাও এমন ঘরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইনি, যেখানে সুখ বাসা বেঁধে আছে। একটি সুখময় ও উপভোগ্য জীবন কাটানোর পদ্ধতি যদি মা-বাবার জানা থাকে, তাহলে সুখ এবং ঘর—শব্দ দুটির মাঝে আর কোনো অর্থগত পার্থক্য থাকে না। বরং উভয় শব্দ সমার্থক ও অভিন্ন হয়ে যায়।

সুখী ঘর তো তা-ই, যেখানে নেই কোনো বিভেদ ও ঝগড়াঝাটি। যেখানে শোনা যায় না কোনো বিষাক্ত ও কঠোর কথা কিংবা তিক্ত সমালোচনা। সুখী ঘর তা-ই, যেখানে পরিবারের সদস্যরা আশ্রয় নিলে অনুভব করে শান্তি, নিরাপত্তা ও নির্মল আরাম।

ঘরে সুখী পরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব পিতামাতার ওপর বর্তায়। অনেক সময় বিষাক্ত জবান ও ঝগড়াপ্রবণ বদমেজাজের কবলে পড়ে ঘর ধ্বংস হয়ে যায়। আবার অনেক সময় মা-বাবার কোনো একজনের মধ্যে আধিপত্যের লোভ এবং একের প্রতি অপরের মান্যতা ও নিষ্ঠার অভাব সুখী ঘরের ভিত নিঃশেষ করে দেয়। এহেন অবস্থায় সন্তানেরা বাবা-মায়ের জীবন অনুকরণ করে ক্ষমতার লালসা, ঝগড়াঝাটি ও আক্রমণাত্মক কথা ও আনুগত্যহীনতার ওপর বেড়ে ওঠে। পরিবারের সদস্যরা যখন এ সকল স্বভাব নিয়ে বড় হয়, তখন ঘর থেকে সুখের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যায়!

বাস্তবতা হলো, আমরা আমাদের সন্তানদের ধোঁকা দিতে পারি না। তারা আমাদের গোপন ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি জানে। ঘরে এবং অন্যান্য লোকদের বেলায় আমরা কেমন আচরণ ও ব্যবহার প্রদর্শন করি, তার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কেও তারা অবগত আছে। তাই তারা আমাদের অনুসরণ করে কিংবা আমাদের ওপর এমন হুকুম

আরোপ করে, যা তারা অন্যদের বেলায়ও প্রয়োগ করে। আর আমাদের প্রতি যদি তাদের আস্থা কমে যায়, তাহলে সেসমস্ত লোকদের প্রতিও তাদের আস্থা হ্রাস পাবে, যাদের সাথে তারা বর্তমানে বাস করছে এবং ভবিষ্যতে বাস করবে।

বিষণ্ণতা ও অসুখ নানান ধরনের রোগের সৃষ্টি করে। এটি তো বড় অজ্ঞতা যে, অতি সামান্য ও তুচ্ছ কারণে আমরা আমাদের জীবনকে বিষণ্ণ করে তুলবো কিংবা নিজেদের ক্রোধ জাগিয়ে তুলবো। দেখা যায়, আমরা নগণ্য বিষয়ে চরমভাবে ফুঁসে উঠি। অথচ সেগুলো এতটাই ক্ষিপ্ত হওয়ার মতো বিষয় ছিল না। ফলে আমাদের প্রেসার বেড়ে যায়। হৃৎকম্প শুরু হয়ে যায়। পেটে গণ্ডগোল বেঁধে যায়। এরূপ আরো বহু রোগ দেখা দেয়, যেগুলো আমাদের গোটা জীবনকে অস্থির ও অসুখী করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১. কীভাবে আপনি সুখী পরিবার গঠন করবেন?

অনেকেই জানতে চান যে, আপন আপন ঘরে তারা কীভাবে সুখ প্রতিষ্ঠা করবেন এবং কেন তারা নিজেদের পরিবারকে স্থায়ীভাবে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছেন?

সাইয়িদা আমিনা সাইদ বলেন—

> সুখ আল্লাহর বিশেষ এক দান। তিনি তা যাকে ইচ্ছে দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছে ছিনিয়ে নেন। আর নিজ হুকুমে আল্লাহর রয়েছে বিশেষ অবস্থা। সুখ যদি বানানো যেতো, তাহলে এ ভূমণ্ডলে কোনো হতভাগা ও দুর্ভাগা থাকতো না। এ সুবিশাল জীবনে যেকোনো মানুষই নিজের জীবনের অর্ধেক কুরবানি করে দিতে রাজি হবে, যদি বাকি অর্ধেক জীবনে সুখ লাভের ব্যাপারে জামানত নিতে পারে। সুখের উপকরণ যদি পৃথিবীর সর্বশেষ প্রান্তেও বিদ্যমান থাকতো, তার পরও সেখানে যেতে আমরা অবহেলা করতাম না; যদিও এর জন্য আমাদেরকে আগুন এবং কাঁটার ওপর দিয়ে চলতে হয়।
>
> জীবনের সকল প্রকার সুখের মতোই ঘরের সুখটাও অভ্যন্তরীণভাবে সাজানো ও সুবিন্যস্ত। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ীই তা তৈরি হয়। তাতে তাকদিরেরও বড় ভূমিকা থাকে। তবে সুখ অর্জনের পথ সুগম করা এবং এর উপযুক্ত পরিবেশ দ্বারা নিজেদের পরিবেষ্টিত করা আমাদেরই হাতে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অন্তত একবার হলেও সুখ সকল মানুষের ঘর পরিদর্শন করতে আসে। তখন যদি সে তাতে নিজের উপযুক্ত পরিবেশ পায়, তাহলে সেখানে থেকে যায়। আর যদি পরিবেশ নিজের বিপরীতে দেখতে পায়, তাহলে সেখান থেকে কেটে পড়ে। বুদ্ধিমান তো সেই, যে সুযোগটি

কাজে লাগায় এবং সুখময় পরিবার গঠনে মৌলিক উপকরণসমূহের ব্যবস্থা করে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

সুখী পরিবার গঠনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মুহব্বত-ভালোবাসা-প্রীতি। এর দ্বারা আমি সেই পাগলাটে অনুভূতি বোঝাতে চাইনি, যা আগুনের মতো হঠাৎ জ্বলে উঠে আবার আকস্মিক নিভে যায়। বরং এর দ্বারা আমি স্বামী-স্ত্রীর আত্মিক মিল এবং দারুণ আবেগময় অনুভূতির কথাই বোঝাতে চেয়েছি।

সুখী পরিবার একমাত্র মুহব্বতের ওপরই টিকে থাকে না। এর পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরকে ক্ষমা করার মনোভাব থাকাও অপরিহার্য।

ক্ষমার গুণ তখনই আসবে, যখন উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সুধারণা ও আস্থা থাকবে। আমরা আমাদের পরিবারে এ ব্যাপারে অনেক বেশি সফল হবো, যদি আমরা বিশ্বাস করে নিতে পারি যে, আমরা মানুষ। আর ভুল মানুষেরই হয়। সুতরাং এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন কথায় কিংবা কাজে ভুল করে ফেললে, সেটি আর অদ্ভুত মনে হবে না। ভুল করে স্বীকার না যাওয়া কিংবা তা না শোধরানোই হলো প্রকৃতপক্ষে বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক।

আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, ভুলের কারণে অন্য মানুষের মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এই ভুল সে নিজের মনে সংরক্ষণ করতে থাকে। কালক্রমে সে তা দিয়ে এমন এক আগ্নেয়গিরি তৈরি করে, যা সামান্য সময়ে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। ফলে ঘর স্থায়ীভাবে শান্ত হয়ে যায়।

সুখী পরিবার গঠনে পারস্পরিক সহযোগিতাও প্রধান একটি কারণ। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া ভালোবাসা ও ক্ষমার ভিত্তিমূলগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। পারস্পরিক সহযোগিতা দুভাবে হতে পারে। নৈতিকভাবে। আর্থিকভাবে। নৈতিকভাবে সহযোগিতার অর্থ হলো, পারিবারিক যেকোনো সমস্যা মোকাবিলার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। কারণ, অধিকাংশ সময় পরিবারে অশান্তি দেখা দেওয়ার কারণ হলো, স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের কষ্টের মূল্যায়ন করে না কিংবা তাদের একজন শুধু নিজের অধিকারটাই বুঝে, অপরজনেরটা বুঝতে চায় না।

সুখী পরিবার গঠনে মৌলিক কারণগুলো কী কী—তা উল্লেখ করতে হলে চারিত্রিক নিষ্কলুষতার কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অবশ্যই উল্লেখ করতে

হবে। কেননা, এটিই সম্মানজনক জীবনের চাবিকাঠি এবং মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মূল উপকারিতা।

প্রকৃত চারিত্রিক নিষ্কলুষতার মধ্যে কথা কাজ এবং চিন্তাও অন্তর্ভুক্ত। কারণ, চারিত্রিক নিষ্কলুষতার ফলেই জবান বহু স্খলন থেকে হেফাজতে থাকে, বিবেক নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। এ চারিত্রিক নিষ্কলুষতাই মানুষের কর্মসমূহকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পবিত্র রাখে এবং সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখে।[৬৩]

কোনো এক সমাজবিজ্ঞানী লিখেছেন—আমার অভিজ্ঞতা বলে, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্য সর্বোত্তম যে পন্থাটি বেছে নিতে পারে, তা হলো, এমন কোনো ঝগড়ায় তারা জড়াবে না, প্রথম অবস্থাতেই যার আগুন এক গ্লাস পানি দিয়ে নেভানো সম্ভব নয়। কেননা, স্বামী-স্ত্রীর যেসমস্ত ঝগড়াঝাটির ইতি হয় তালাক দিয়ে, সেগুলোর অধিকাংশেরই পেছনে থাকে নগণ্য ও তুচ্ছ কিছু বিষয়। কিন্তু এসব তুচ্ছ বিষয়ই ধীরে ধীরে এত বড় আকার ধারণ করে যে, তা আর সংশোধন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বৈবাহিক সুখ অনেকটা মৌচাকের মতো। দুটি মৌমাছি মিলে সেটা তৈরি করে। এ মৌচাক তৈরিতে তাদের পরিশ্রম যত বেশি হবে, তাতে মধুর স্বাদও হবে তত বেশি।

২. নারী ও সুখ

কখনো কখনো নারীই তার কাঙ্ক্ষিত সুখের উপকরণ নির্ধারণে অধিক সামর্থ্যবান হয়। সুতরাং সে চায়, একজন শক্তিমান স্বামী সন্তানাদি চমৎকার বাড়ি ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা। এগুলোই তার মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তার মাথায় এগুলোই ঘুরপাক খায় এবং সে এসবেরই স্বপ্ন দেখে আর আল্লাহর কাছে কোনো একদিন তা বাস্তবায়নের আশা রাখে।

স্ত্রীর দৃষ্টিতে নেককার স্বামী যেকোনো পুরুষের মতো নয়। সে তো এমন পুরুষকে মূল্যায়ন করে না, যে সর্ববিষয়ে আপন স্ত্রীর ওপর নির্ভর করে এবং তাকে দিকনির্দেশনা দেওয়া কিংবা রক্ষা করার ক্ষেত্রে যার কোনো হিসেবনিকেশ নেই।

নারীরা চায় তার হবে কঠোর ব্যক্তিত্বের অধিকারী, মমতাময়, যেকোনো জিনিস বোঝার ক্ষেত্রে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, বিশ্বস্ত উপদেশদাতা, অন্তরঙ্গ বন্ধু, নিষ্ঠাবান প্রেমিক এবং এমন পুরুষ, যার ওপর সত্যিই সে ভরসা করতে পারে।

---

[৬৩] আল-হিলাল ম্যাগাজিনের ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত সাইয়েদা আমিনা সাঈদের প্রবন্ধ 'মা হুয়াল বাইতুস্ সাঈদ'।

৩. পুরুষ ও সুখ

পুরুষরা অনেক উচ্চাভিলাষী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়। তাদের সবচেয়ে বড় মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে সম্পদ শক্তি খ্যাতি ও ক্ষমতা। তাদের এ সকল আকাঙ্ক্ষা যখন পুরা হয় এবং তারা নিজেদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় পেয়ে যায়, তখন কি আমরা তাদের সুখী দেখতে পাই?

যে পুরুষ সর্বদা মানুষের সম্মান পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং তাদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে অপ্রস্তুত থাকে, অধিকাংশ সময় সেই পুরুষ দুঃখী ও হতভাগা হয়। মনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের পথে অন্যতম বড় বাধা হলো খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির পেছনে ছোটা। সফলতা নিঃসন্দেহে সুখের অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু সুখ লাভের জন্য তা একাই যথেষ্ট নয়। বরং কোনো কোনো সময় তো এই সফলতাই দুঃখের বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং পুরুষ যদি স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, আপন কর্মে সফল হয় এবং রাতদিনের পালাবদলে ও গরম-ঠান্ডার পরিবর্তনে খুশি থাকে, তাহলেই সে জীবনে সুখী ও ভাগ্যবান।

কিন্তু সে যদি স্ত্রীর প্রতি থাকে নারাজ, সন্তানাদির প্রতি থাকে আস্থাহীন, নিজের কর্মকে বুকের ওপর চেপে বসা ভয়ংকর বিপদ মনে করে, দিনের বেলায় রাত আসার আকাঙ্ক্ষা করে এবং রাত হলে দিন হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, তাহলে তার উচিত নিজের মনকে পুনরায় নিরীক্ষণ করে আপন অবস্থার সংশোধন করা। অন্যথায় তাকে সদা দুঃখ কষ্টে জীবন কাটাতে হবে।

৪. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কিছু পার্থক্য

শুরুতেই তোমাকে স্মরণে রাখতে হবে যে, আপনার এবং আপনার স্ত্রীর মাঝে স্বতন্ত্র অনেক পার্থক্য আছে। কিছু পার্থক্য বংশগতভাবে প্রাপ্ত। সুতরাং সে বংশগতভাবে তার পিতামাতা থেকে যেসকল স্বভাব পেয়েছে, সেগুলো আপনি আপনার পিতামাতা থেকে বংশীয়ভাবে যা পেয়েছেন, তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কিছু পার্থক্য আছে পরিবেশগত। দ্বীন পালনে কিংবা সামাজিক রীতিনীতিতে অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে সে যেই পরিবেশে ছিল, সেটা আপনার পরিবেশ থেকে ভিন্ন রকম। আবার কখনো স্বভাবগত পার্থক্যও থাকে। সুতরাং একজন একটু রসিক ও ইতিবাচক মানসিকতার অধিকারী। কিন্তু অপরজন থাকে এর বিপরীত।

চারিত্রিক কিছু পার্থক্যও বিদ্যমান থাকে। তাই স্বামী-স্ত্রীর একজন হয় মহৎ ও উদার প্রকৃতির। আরেকজনের মধ্যে এই উদারতা ও মহানুভবতা অতি সামান্যই থাকে। শিক্ষা সংস্কৃতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও কালচারগত কিছু পার্থক্য থাকে।

কিন্তু ভিন্নতা ও অমিলের এতসব দিকের উপস্থিতি সত্ত্বেও অভিন্নতা ও মিলেরও বহু বিষয় বিদ্যমান আছে। এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং শক্তি অর্জনের জন্য এই বিষয়গুলোই কাজে লাগানো উচিত। ফলে একই সময়ে ভিন্নতার দিকগুলোও আস্তে আস্তে বিগলিত হতে থাকবে এবং আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর বাস্তবায়নও ঘটবে:

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة .

তার একটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো। আর তিনি তোমাদের দান করেছেন ভালোবাসা ও দয়া। [সুরা রুম, আয়াত : ২১]

সুতরাং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আপনাদের মাঝে যে বৈপরীত্য ও ভিন্নতা আছে, সেটি যেন আপনাদের মাঝে পূর্ণতা এনে দেয় এবং আপনাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতায় যে ত্রুটি ও অপূর্ণতা আছে, অপরের অভিজ্ঞতার সহযোগিতায় সেটি যেন দূর করা যায়। আর কিছু অভ্যাস এবং আগ্রহের বিষয় তো ছাড়তেই হয়। আপনার স্ত্রী যখন অনুভব করবে যে, আপনি তার সুখের জন্যই নিজের প্রিয় কিছু বিষয় বিসর্জন দিয়েছ, তখন সে-ও একই কাজ করতে উদ্যোগী হবে এবং নিজের কিছু প্রিয় বিষয়ও সে বিসর্জন দিয়ে দেবে।

যেসকল বিষয়ে আপনার সাথে আপনার স্ত্রীর অমিল ও পার্থক্য আছে, সেগুলো আপনাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির কার্যকারণ হতে পারে। সুতরাং আপনি এই কারণে প্রতারিত ও লজ্জিত হবেন না যে, আপনি এমন নারী বিবাহ করতে পারেননি, যে আপনার বিশেষ যোগ্যতা অনুসারে কাজ করতে পারবেন কিংবা আপনি যেই শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তিনিও একই শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যেহেতু বিষয়টি বৈবাহিক সুখ লাভের সাথে সম্পৃক্ত, তাই এখানে জীবনের অভিজ্ঞতা এবং জীবনের বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের পদ্ধতিই সার্টিফিকেটের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।[৬৪]

স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেরই জানা উচিত, বৈবাহিক সুখ অর্জন করতে হলে তাদের সম্পর্কের ভিত্তি হতে হবে আল্লাহর ভয় এবং তার শরিয়ত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রাসাদ তাকওয়ার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হবে, তা যেকোনো সময় কেঁপে উঠতে পারে এবং ধ্বংসের সম্মুখীন হতে পারে।

---

৬৪ ইউসুফ মিখাইল আসাদ রচিত কাইফা তুআমিলু জাওজাতাকা গ্রন্থ।

এ কারণেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন— নারীকে বিবাহ করা হয় চার কারণে। সম্পদের কারণে, মর্যাদার কারণে, সৌন্দর্যের কারণে এবং দ্বীনের কারণে। কিন্তু তুমি দ্বীনদারিকে গ্রহণ করো। তবেই তুমি সফলকাম হবে।[৬৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন— মুমিন বান্দা তাকওয়া অর্জনের পর এমন নেককার স্ত্রীর চেয়ে অধিক কল্যাণকর কোনো কিছু লাভ করতে পারে না যে, তাকে আদেশ করলে সে তা পালন করে, তার দিকে তাকালে খুশিতে মন ভরে যায়, তার ব্যাপারে কোনো কসম করলে সেটা পূরণ করে, তার থেকে অনুপস্থিত থাকলে সে তার নিজের ব্যাপারে ও স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে তাকে নিশ্চিন্ত রাখে।[৬৬]

৫. কীভাবে স্ত্রীকে সুখী করবেন?

- কখনো আপনার স্ত্রীকে অপমান করবেন না। স্ত্রীর সাথে যেকোনো ধরনের অপমানজনক আচরণ করলে সেটা তার অন্তরে এবং মাথায় গেঁথে যায়। সবচেয়ে মারাত্মক অপমান যার ব্যাপারে আপনার স্ত্রী আপনাকে মৌখিকভাবে ক্ষমা করে দিলেও মন থেকে কখনো ক্ষমা করতে পারবে না, সেটা হলো, আপনি রেগে গিয়ে তাকে প্রহার করলেন কিংবা তাকে গালিগালাজ করলেন অথবা তার মা-বাবাকে অভিশাপ দিলেন বা তার ইজ্জতের ব্যাপারে তার ওপর অপবাদ আরোপ করলেন।
- আপনার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করুন। তাহলে তিনিও আপনারা প্রতি ভালো ব্যবহার দেখাবেন। তার ভেতর এই অনুভূতি সৃষ্টি করুন যে, আপনি তাকে নিজের উপর প্রাধান্য দেন, তাকে সুখী করতে আপনি যারপরনাই আগ্রহী, তার সুস্থতার প্রতি আপনি যত্নবান, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আপনি সামর্থ্য অনুযায়ী তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন।
- মনে রাখুন, আপনার স্ত্রী খুব পছন্দ করে, আপনি তার পাশে বসে তার সাথে খোশগল্প করুন এবং আপনার মনের যেকোনো সমস্যার জন্য আপনি তার কাছে আশ্রয় নিন। গোমড়ামুখো ও ভ্রু কুঁচকে নীরব ও বোবা হয়ে ঘরে প্রবেশ করবেন না। কারণ, এ অবস্থা স্ত্রীর হৃদয়ে সংশয় ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে।
- আপনার শিক্ষা কিংবা বিশেষ যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগত আগ্রহ আপনি আপনার স্ত্রীর ওপর চাপাতে যাবেন না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি আকাশ বিজ্ঞানের শিক্ষক হন, তাহলে আপনি এই আশা করতে যাবেন না যে, আকাশ ও নক্ষত্ররাজি নিয়ে আপনার অনুরূপ আগ্রহও স্ত্রীর থাকুক।

---

[৬৫] হাদিসটি ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন।
[৬৬] ইমাম ইবনু মাজাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

- আপনার জীবনে আপনি সৎ হোন। তাহলে আপনার স্ত্রীও তার জীবনে সৎ হবে। হাদিসে এসেছে—তোমরা নিজেরা পবিত্র হও। তাহলে তোমাদের স্ত্রীরাও পবিত্র হবে।[৬৭]
- সাবধান! সেই নারীর দিকে দৃষ্টি দেবেন না, যার দিকে দৃষ্টি দেওয়া আপনার জন্য হালাল নয়। চাই রাস্তায় হোক কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় হোক। স্যাটেলাইট বড়ই খারাপ। এর কারণেই বৈবাহিক নানান সমস্যা দেখা দিয়েছে।
- কখনো স্ত্রীর আত্মমর্যাদাবোধ উসকে দেবেন না। সময়ে-অসময়ে তাকে এ কথা বলবেন না যে, আপনি অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করবেন কিংবা তার সামনে কোনো নারীর প্রতি আপনার মুগ্ধতার প্রকাশ ঘটাবেন না। কারণ, এসব কথা স্ত্রীর হৃদয়ের গহিনে আঘাত করে এবং তার শান্তি ও ভালোবাসাকে কেড়ে নিয়ে তাকে চিন্তা ও পেরেশানির সাগরে ভাসিয়ে দেয়। অনেক সময় স্ত্রীর মাথাব্যথা, এই ব্যথা, সেই ব্যথা ইত্যাদি নানাবিধ শারীরিক সমস্যার কারণে স্বামীর মুখ দিয়ে এসব কথাবার্তা প্রকাশ পায়। তাই এ অবস্থায় স্বামীর উচিত, নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এক ডাক্তার থেকে আরেক ডাক্তারের কাছে যাওয়া।
- নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রীর কোনো ভুলত্রুটি হয়ে গেলে সেগুলো তাকে বারবার স্মরণ করাবেন না এবং এর কারণে তাকে তিরস্কার ও লজ্জা দেবেন না। বিশেষ করে অন্যের সামনে তো এমনটি কখনোই করবেন না।
- মাঝেমধ্যে আপনিও নিজের চালচলন ঠিক করবেন। সর্বদা আপনার স্ত্রীই নিজের চালচলন ঠিক করবে আর আপনি আপনার পূর্বের চালচলনই ধরে রাখবে—এটি কখনোই কাম্য নয়।
- যে সকল বিষয় আপনার স্ত্রীকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে সেগুলো পরিহার করুন; যদিও তা রসিকতাই হোক না কেন।
- আপনার স্ত্রীর প্রশংসনীয় গুণগুলো আপনি অর্জন করুন। কেননা, এমন বহু পুরুষ আছে, দ্বীন পালনের প্রতি যাদের মনোযোগ বেড়ে গেছে, যখন তারা নিজেদের স্ত্রীদের মধ্যে ধর্মীয় ও চারিত্রিক মূল্যবোধ দেখতে পেয়েছে এবং প্রত্যক্ষ করেছে তাদের উন্নত চালচলন।
- সর্বদা শান্ত থাকুন এবং রাগ করবেন না। যেমনটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন। কেননা, ক্রোধই হলো ঘৃণা-বিদ্বেষ ও বিরোধের ভিত্তি।

[৬৭] হাদিসটি ইমাম তাবারানি রহ. বর্ণনা করেন।

আপনি যদি কখনো আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে কোনো ভুল করে থাকেন, তাহলে এর জন্য তার কাছে ক্ষমা চান। আপনি যদি তার প্রতি রাগান্বিত থাকেন আর এ কারণে তিনিও পেরেশান এবং কাঁদতে থাকেন, তাহলে এ অবস্থায় আপনি রাত্রে ঘুমাবেন না। আপনি স্মরণ করে দেখুন, যে কারণে আপনি রেগে আছেন অধিকাংশ সময় তা এমনই তুচ্ছ কারণ হয়ে থাকে যা আপনাদের বৈবাহিক জীবনের স্বচ্ছতাকে কলুষিত করার উপযুক্ততা রাখে না এবং এর কারণে এতটা ক্ষিপ্ত হওয়ারও প্রয়োজন ছিল না।

বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চান। আপনার ক্রোধ প্রশমিত করুন এবং ভাবুন, আপনার এবং আপনার স্ত্রীর মাঝে যে বন্ধন ও ভালোবাসা বিদ্যমান, তা এর থেকে বহুগুণ ঊর্ধ্বে যে, সেটাকে ক্রোধের সাধারণ একটি মুহূর্ত এবং আকস্মিক উত্তেজনা কলুষিত করে দেবে।

- আপনি আপনার স্ত্রীকে তার নিজের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী করে তুলুন। তাকে এমন অনুসারী বানাবেন না, যে আপনার ছায়াপথ ধরেই ঘুরে থাকবে। এমন সেবিকা বানাবেন না, যে শুধু আপনার আদেশই বাস্তবায়ন করতে থাকবে। তাকে এ ব্যাপারে জাগিয়ে তুলুন যে, তারও একটি সত্তা আছে এবং আছে চিন্তাভাবনা করার ও সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতা। আপনি আপনার যাবতীয় বিষয়ে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করুন এবং উত্তম পন্থায় তার সাথে আলোচনা করুন। আপনার কাছে তার সিদ্ধান্তটি অধিকতর সঠিক মনে হলে সেটাই গ্রহণ করুন এবং এ ব্যাপারে তাকে অবহিত করুন।

- আপনার স্ত্রী প্রশংসনীয় কোনো কাজ করলে তার প্রশংসা করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও আদায় করতে পারে না।[৬৮]

- আঘাত দিয়ে কথা বলা এবং তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকুন। তাকে আপনি আপনার সেসকল নিকটাত্মীয়ের সাথে তুলনা করবেন না, যাদের আপনার মুগ্ধতা আছে। বরং আপনি তাকে বলে দিন, সে যেন সর্বক্ষেত্রে তাদের উত্তম আদর্শরূপে গ্রহণ করে।

- স্ত্রীর মধ্যে এমন সব সম্ভাবনা তৈরির চেষ্টা করুন, যা তাকে অধ্যবসায় ও জ্ঞান অর্জনে অনুপ্রেরণা জোগাবে। এরপর সে যদি জ্ঞানের কোনো শাখায় ডিগ্রি অর্জন করতে চায়, তাহলে তার জন্য তার ব্যবস্থা করে দেবেন; যতক্ষণ পর্যন্ত তা দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির সাথে সাংঘর্ষিক না হয় এবং তাকে বৈবাহিক ও পারিবারিক

[৬৮] হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহ. বর্ণনা করেন এবং বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।

দায়িত্বাবলি থেকে উদাস না করে দেয়। আপনার স্ত্রী নিজ কর্মে সফলতা লাভ করলে তার পক্ষে সহমত পোষণ করুন।

- মনোযোগ দিয়ে আপনার স্ত্রীর কথা শুনুন। কারণ, এটি আপনার স্ত্রীকে চিন্তা ও পেরেশানি থেকে বের করে আনবে এবং ক্রোধ ও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া থেকে বিরত রাখবে। অবশ্য কিছু মহিলা আছে, যারা মুখ বন্ধ করে থাকতে পারে না কিংবা আপনার পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে নিন্দার ঝড় বইয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে আপনাকে বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে এবং সুন্দর সুন্দর নসিহতের মাধ্যমে বিষয়টির মোকাবিলা করতে হবে।

- আপনার স্ত্রীর মাঝে এই অনুভূতি জাগ্রত করুন যে, সে আপনার কাছে যেকোনো ধরনের বিপদ থেকে নিরাপদে আছে এবং তার ব্যাপারে আপনি কখনো অবহেলা করতে পারেন না কিংবা তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন না।

- আপনার স্ত্রীকে বুঝতে দিন যে, সে যতই সম্পদশালী হোক আর্থিকভাবে তাকে দেখাশোনার দায়িত্ব আপনার। সে তার পিতা থেকে যে সম্পদ লাভ করেছে তার প্রতি কখনো লোভ করবেন না। কারণ, স্ত্রীর সম্পদে দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠা করা শরিয়ত আপনার জন্য বৈধ করেনি।

সে ধনী—এই অজুহাতে তার ব্যাপারে কার্পণ্য করবেন না। কারণ, সে যতই ধনী হোক, তার এ বিষয়টি অনুভব করার প্রয়োজন আছে যে, আপনিই তার পিতার প্রকৃত বিকল্প ব্যক্তি।

- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে সতর্ক হোন এবং ইসলামের গণ্ডির বাইরে সামাজিক মেলামেশা থেকেও বিরত থাকুন। কেননা, বহু সংসার ভেঙে যাওয়ার মূল উৎস এ সমস্ত দেখাসাক্ষাৎ ও অযাচিত সম্পর্ক।

- নিজের মাহরাম ছাড়া অন্য কাউকে আপনার ঘরে ঢুকতে দেবেন না। সে যেই হোক না কেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—সাবধান! মহিলাদের কাছে তোমরা যেয়ো না।[৬৯]

- স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা এবং নিজের পিতামাতা ও পরিবারের প্রতি ভালোবাসার মাঝে সামঞ্জস্য ঠিক রাখুন। একদিক যেন অপরদিকের ওপর বেড়ে না যায় এবং ভালোবাসা যেন আরেক ভালোবাসার হিসেব নিতে প্রভাব না খাটায়। প্রত্যেককেই তার ভালোবাসার হক বুঝিয়ে দিন উত্তমরূপে এবং সঠিক পন্থায়।

---

[৬৯] হাদিসটি ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনা করেছেন।

- জীবনের সকল ক্ষেত্রে আপনি আপনার স্ত্রীকে নিজের জন্য যেমন দেখতে ভালোবাসেন, আপনিও আপনার স্ত্রীর জন্য তেমন বনে যান। কারণ, তিনিও আপনার তেমনটিই আশা করেন, যেমনটি আপনি তার থেকে আশা করেন।

- ঘরের বাইরে গিয়ে তাকে কিছুটা বিনোদনের সুযোগ দিন। বিশেষত সন্তানাদি হওয়ার আগে। কারণ, সন্তান হওয়ার পর তো সে তাদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

- মানসিকভাবে যে-সব বিষয়ে তিনি আপনাকে অংশীদার বানাতে পছন্দ করেন, সেসব বিষয়ে আপনিও তাকে অংশীদার বানান। সুতরাং আপনি তার পরিবারের সাথে পারিবারিক সাক্ষাৎ করুন। তবে নারী-পুরুষের অবৈধ মেলামেশা ছাড়া। আল্লাহর রাসুলের মধ্যেই আপনার জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।

- আপনি আপনার কাজে প্রয়োজনের চেয়ে এত অধিক ব্যস্ত হবেন না যে, আপনার স্ত্রী তা দেখে ঈর্ষান্বিত হন। আপনার কাজ যেন আপনার পূর্ণসময়কে খেয়ে না ফেলে। বিশেষত ছুটির দিনগুলোতে। এ দিনগুলোতে ঘরের ভেতরে বা বাইরে আপনি তাকে নিজের থেকে বঞ্চিত করবেন না। যাতে করে তিনি বিরক্তি ও কষ্ট অনুভব না করেন।

- আপনি আপনার মতামতের ব্যাপারে একগুয়ে হবেন না। বরং স্ত্রীর সাথেও পরামর্শ করুন এবং তার মতামত সঠিক হলে সেটিই গ্রহণ করুন। আর যদি তার মতের সাথে আপনার মতের ভিন্নতা দেখা দেয়, তাহলে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ও নম্রভাবে তাকে নিজের মতের প্রতি রাজি করান।

- আপনি যখন ঘর থেকে বের হবেন, তখন তাকে মুচকি হেসে এবং দুআ চেয়ে বিদায় দিন। আর যখন ঘরে ফিরে আসবেন, তখন না জানিয়ে হঠাৎ আসবেন না; যেন তিনি আপনার সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে এবং তিনি যেন এমন অবস্থায় না থাকেন, যে অবস্থায় আপনি তাকে দেখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। বিশেষ করে আপনি যখন সফর থেকে আসবেন।

- তাকে নিয়ে একসাথে একটি ইসলামি চশমা দিয়ে জীবনটার দিকে তাকান। ভুলে যাবেন না, আপনিই সবচেয়ে শক্তিশালী। আপনার প্রিয় বন্ধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে অসিয়ত করে বলে গিয়েছেন—

- কাচের বোতল কোমল হাতে ধরো। [সূত্র : হাদিসটি ইমাম আহমাদ রহ. বর্ণনা করেন।]

- [সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত দিক থেকে] নারীরা পুরুষদেরই মতো। [সূত্র : হাদিসটি ইমাম আহমাদ র. বর্ণনা করেন।]

- যে আল্লাহ এবং পরকালের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। নারীদের প্রতি তোমরা হিতাকাঙ্ক্ষী হও। [সূত্র : হাদিসটি ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।]

- ঘরের বিভিন্ন কাজে আপনি আপনার স্ত্রীকে সহযোগিতা করতে চেষ্টা করুন। স্ত্রীদের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম আচরণের মধ্যে এটিও ছিল যে, তিনি তাদেরকে ঘরের কাজে সহযোগিতা করতেন। আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ পরিবারের কাজে অংশগ্রহণ করতেন। অতঃপর নামাজের সময় হলে তিনি নামাজের জন্য বের হতেন। [সূত্র : হাদিসটি ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।]

- আপনি আপনার স্ত্রীর কিছু দোষত্রুটি থেকে চোখ গুটিয়ে নিতে চেষ্টা করুন এবং তার সেসব উত্তম ও সুন্দর গুণাবলি স্মরণ করুন, যেগুলো তার দোষসমূহ ঢেকে রাখে। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—কোনো মুমিন পুরুষ কোনো মুমিন নারীকে ঘৃণা করতে পারে না। যদি সে তার কোনো আচরণ অপছন্দ করে, তাহলে তার অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। [সূত্র : হাদিসটি ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন।]

- স্বামীর উচিত স্ত্রীকে সোহাগ করা এবং তার সাথে রসিকতা করা। এ ক্ষেত্রে আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করুন। তিনি এক সাহাবিকে বলেছিলেন, তুমি কুমারী নারীকে কেন বিবাহ করলে না? তাহলে তো তুমি তার সাথে খেলতে পারতে, সেও তোমার সাথে রসিকতা করতে পারত। [সূত্র : হাদিসটি ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো এত কঠোর ও রূঢ় প্রকৃতির মানুষ পর্যন্ত বলেছেন, পুরুষের জন্য উচিত, স্ত্রীর সামনে (আদর সোহাগ ও নম্রতার ক্ষেত্রে) শিশুর মতো হয়ে যাওয়া। কিন্তু জনগণের মাঝে থাকলে আবার পুরুষ হয়ে যাবে।

- উদারচিত্তে আপনার স্ত্রীর সমালোচনা শুনুন। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ কোনো বিষয়ে তার কাছে বারবার যেতেন। কিন্তু তিনি তাদের ওপর রাগ করতেন না।[৭০]

- আপনি কখনো এই অভ্যাস গড়ে তুলবেন না যে, সর্বদা স্ত্রীর চিন্তাভাবনা ও কথাবার্তাকে অবমূল্যায়ন করেন কিংবা তার পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন অথবা তার ওপর হাত গুটিয়ে খরচ করেন।

---

[৭০] উস্তাদ মাহমুদ আস-সাব্বাগ রচিত আস-সাআদাতুয্ যাওজিয়্যাহ গ্রন্থ

- আপনার স্ত্রীকে আপনি ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করবেন না। এই আশা করবেন না যে, তার কর্মের জবাবগুলো সর্বদা সঠিক হবে। কারণ, তিনিও তো একজন মানুষ। আর আদম সন্তান মাত্রই ভুল করে।
- সৌন্দর্য শিক্ষা ও ধনসম্পদের ক্ষেত্রে আপনার স্ত্রীকে অন্য কোনো নারীর সাথে তুলনা করবেন না কিংবা আপনার পরিবারের সাথে তার পরিবারকে মিলাতে যাবেন না। এতে করে স্ত্রীর অন্তরে আত্মমর্যাদাবোধের আগুন জ্বলে ওঠে। এ আগুন জ্বলে উঠার পর তা নেভানোর চেয়ে এমনসব কথা ও বিষয়বস্তু এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।
- স্ত্রীর দোষত্রুটি নিয়ে কারো সামনে মুখ খুলবেন না। কারণ, আপনি এবং আপনার স্ত্রী এক পাল্লায় আর গোটা পৃথিবী আরেক পাল্লায়।
- স্ত্রী ও সন্তানাদি রেখে সম্পদ উপার্জন করতে বিদেশে পাড়ি জমাবেন না। কারণ, একমাত্র রুটি-রুজির কারণেই মানুষ বেঁচে থাকে না। মনে রাখুন, যে স্ত্রী সন্তান রেখে বিদেশ গমনে প্রলুব্ধ করে, এমন প্রত্যেকের দরজাতেই কিন্তু বিপদের ঘণ্টা বাজে।

আপনি আপনার জীবনের সাথে সংগ্রাম করুন। তবে আপনার স্ত্রীকে ছেড়ে নয়। জেনে রাখুন, স্ত্রী ও সন্তানদের ছেড়ে কয়েক বছর বিদেশ করার পর যদি আপনি সমগ্র পৃথিবীর ধনসম্পদ তাদের কোলে এনে দেন, তখন তাদের দৃষ্টিতে আপনার মূল্য বাকি থাকবে না। শেষ হয়ে যাবে। আপনি তখন কেবল এমন এক অতিরিক্ত হয়ে যাবেন, যার পুনরায় দ্রুত সেখানে চলে যাওয়া যেখানে সে একাকী ছিল।

★ ঘরের ভেতরের কিংবা বাইরের যেকোনো মানুষের দ্বারা আপনার স্ত্রীর ওপর অভিযোগ এলে সেটা চোখ বন্ধ করে মেনে নিয়ে তার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না কিংবা তার ওপর ভিত্তি করে কোনো হুকুম আরোপ করবেন না। বরং এ ক্ষেত্রে আপনার কর্তব্য হলো, তাড়াহুড়ো না করে সময় নিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখা এবং তথ্যের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়া। এ স্থলে কুরআনে কারিমে একজন পুরুষের স্থলে দুজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণের যে নীতি রয়েছে, তাতে আপনার জন্য রয়েছে বিরাট উপদেশ।

৬. কীভাবে স্বামীকে সুখী করবেন?

- আপনার স্বামী ও সন্তানদের সুখে রাখার দায়িত্ব আপনার। স্মরণ রাখুন, স্বামী আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলেই আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—স্বামীকে নিজের প্রতি সন্তুষ্ট রেখে কোনো মহিলা মৃত্যুবরণ করলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৭১]

- স্বামীর ওপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—আল্লাহ কোনো মানুষকে তার সামর্থ্যের বাইরে বাধ্য করেন না। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬] সুতরাং আপনি আপনার সকল চাহিদা একবারেই পেশ করবেন না। যাতে করে আপনার স্বামী বিরক্ত হয়ে আপনার থেকে পালিয়ে না যায়। আপনি যদি আপনার সকল চাহিদা পূরণের জন্য স্বামীকে চাপাচাপি করেন, তাহলে তিনি আপনার কোনো চাহিদাই পূরণ করবেন না। এমনকি তিনি কোনো আফসোস ও অনুশোচনা ছাড়াই আপনাকেও পরিপূর্ণরূপে ছেড়ে দেবে।

উমর ইবনু আবদুল আজিজ তার ছেলেকে যে কথা বলেছিলেন, তা স্মরণ করুন। তিনি বলেছিলেন, আমি যদি তাদেরকে সকল সত্য বিষয় একবারেই মেনে নিতে বাধ্য করি, তাহলে আমার ভয় হয় যে, তারা সবগুলোই ছেড়ে দেবে। কোনোটাই মানবে না।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—আল্লাহ তাআলা সেই নারীকে ভালোবাসেন, যে তার স্বামীর সাথে রসিকতা করে, তার সামনে সাজগোজ করে থাকে এবং অন্য পুরুষ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখে।[৭২]

- আপনি আপনার স্বামীর মধ্যে যে সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নত চরিত্রের সমাহার দেখতে চান, তার সবগুলোই তাকে একবারে অর্জন করতে বাধ্য করবেন না। সকল গুণের সমন্বয় এক ব্যক্তির মধ্যে ঘটে, এমন দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

- কোনো পুরুষ যখন কোনো নারীকে বিবাহ করে, তখন সে তার মধুময় সেই চিত্রের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে, যেমন সে তাকে বাস্তবে দেখেছিল। এই জাদুময়ী নিষ্পাপ স্বচ্ছ চিত্রটি সে তার জন্য আজীবন সংরক্ষণ করে রাখতে চায়। সুতরাং তার স্মৃতিতে অঙ্কিত আপনার চিত্রটি আপনি বিকৃত করবেন না।

- আপনার সৌন্দর্য ও কমনীয়তার প্রতি যত্নবান হোন। আপনার স্বাস্থ্য যেন সতেজ ও সজীব থাকে, অঙ্গভঙ্গি যেন হয় আকর্ষণীয় এবং কথা যেন হয় সুমিষ্ট ও মধুর সেদিকে মনোযোগী হোন। কর্কশ ভাষায় কথা বলবেন না। বাজারি ও সস্তা শব্দ মুখে আনবেন না। বিরক্তিকর পন্থায় ঢেকুর দেবেন না। নারীদের এ সকল কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য থেকে আপনি যদি হাত গুটিয়ে নেন কিংবা এর কোনোটার ব্যাপারে আপনি অবহেলা করেন, তাহলেই আপনার স্বামীর দৃষ্টিতে আপনার ছবির মান হ্রাস

---

[৭১] ইমাম ইবনু মাজাহ ও ইমাম তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেন।
[৭২] হাদিসটি ইমাম দায়লামি বর্ণনা করেন।

পেয়ে যায় এবং আপনি নারীদের সেই নজরকাড়া ছবি থেকে হারিয়ে যাবেন, যা প্রত্যেক পুরুষ তার স্ত্রীর মধ্যে কামনা করে থাকে।

- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেককার স্ত্রীর বিবরণ দিতে এ কথাটিও উল্লেখ করেছেন যে, স্বামী তার (নিজ স্ত্রীর) দিকে তাকালে মনটা খুশিতে ভরে যায়।[৭৩]

- আপনি দ্বীনপালনে মনোযোগী হোন। বাস্তবেও এবং বাহ্যিক বেশভূষায়ও। ইসলাম অনুমোদিত হিজাব পরিধান করুন। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে হলেও আপনার শরীরের কোনো অংশ কর্মচারী চালক অথবা অন্য কারো দৃষ্টিগোচর হওয়ার ব্যাপারে শিথিলতা করবেন না। কেননা, আপনার স্বামী আপনার ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হয় এবং তার প্রবল ইচ্ছা যে, যাদের জন্য আপনাকে দেখা বৈধ তারা ছাড়া অন্য কেউ যেন আপনাকে না দেখে।

এক লোক এমন এক নারীকে বিবাহ করল, যার দ্বীনদারি ও উচ্ছ্বাসের প্রতি সে ছিল মুগ্ধ। তাকে আলোচনার জন্য তার সতীনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে সে নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করল—

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا

> আপনি বলুন, আমাদের কাছে শুধু তাই পৌঁছবে, যা আল্লাহ আমার জন্য লিখে রেখেছেন। [সুরা তাওবা, আয়াত : ৫১]

লোকটি এ কথা শুনে স্ত্রীকে বলল, সে তাকে সর্বদা এই পবিত্র ও উন্নত অবয়বে কল্পনা করতে থাকবে, যা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী, তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্ট এবং উন্নত মৌলিক বিষয়াবলি ও নিষ্কলুষ চিন্তাসমূহ আঁকড়ে থাকবে।

হতে পারে আপনার স্বামীও আপনার মধ্যে অনুরূপ দৃশ্য দেখে থাকে। সুতরাং তার মাথায় এবং হৃদয়ে আপনার যে ছবি অঙ্কিত আছে, আপনি তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন না।

- সন্ধ্যায় আপনার স্বামী ঘরে আসার আগেই আপনি তার জন্য সাজসজ্জা করুন। তাহলে সে ঘরে এসেই আপনাকে উত্তমরূপে অবলোকন করতে পারবেন। পরিচ্ছন্ন ও উপযুক্ত পোশাক পরিধান করুন এবং তার পছন্দের আতর গায়ে মাখুন। আপনার বুকের ওপর তার দেওয়া অলংকার ঝুলিয়ে রাখুন। সে আপনার ওপর তার হাদিয়ার চিহ্ন দেখতে খুব পছন্দ করে। আপনি আপনার কোনো বান্ধবী কিংবা

---

[৭৩] হাদিসটি ইমাম ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেন।

কোনো নিকটাত্মীয়ের সাক্ষাতে গেলে যেভাবে নিজেকে প্রদর্শন করেন, আপনার স্বামীর সামনে নিজেকে সেরূপ প্রদর্শন করুন।

- স্বামীর থেকে উদাসীন হয়ে ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন না। সুতরাং স্বামী যখন ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসে, তখন যেন আপনার রান্নাবান্না পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সাজগোজের যাবতীয় কাজ দেখা না যায়। সে যেন ঘরে এসে আপনাকে শুধু পাকঘরে কিংবা কাজের পোশাকে দেখতে না পায়। স্বামী ঘরে না থাকলে আপনি এ সকল কাজ করুন।

- আপনার ঘর আপনি সর্বোত্তম পন্থায় সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখুন। মাঝে মাঝে বৈঠকখানার সিস্টেমের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন আনুন। ট্যাবলেট ও প্রসাধনীর বিভিন্ন সামানপত্র ইত্যাদি বস্তু রাখার জায়গাগুলো আপনার সুনিপুণ হাতে পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখুন।

- বিবাহের আগে আপনার যে প্রচণ্ড আবেগ-ভালোবাসার গভীর অনুভূতি এবং স্বপ্ন ছিল, সেগুলোর আফসোস করবেন না। কেননা, বিবাহের পর এসব আবেগ অনুভূতি ঠান্ডা হয়ে যায় এবং তাতে গাম্ভীর্য চলে আসে।

- যেসকল কর্মকাণ্ড আপনার স্বামীর আত্মমর্যাদাবোধে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তাকে উদ্বিগ্ন ও অস্থির করে তোলে, সেগুলো থেকে আপনি যোজন যোজন দূরত্ব বজায় রাখুন।

- স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষ যদি হয় প্রধান কর্তৃত্বকারী, তাহলে আপনার দায়িত্ব হবে বৈবাহিক জীবনে সফলতা এনে দেওয়া এবং সামঞ্জস্য ঠিক রাখা। আপনি যতই শিক্ষিত এবং জ্ঞানী হন, আর যতই আপনার ক্ষমতা ও দাপট থাকুক, স্বামীর কাছে নত হয়ে থাকুন, তার কাছেই আশ্রয় খুঁজুন। তার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবেন না। কোনো ব্যাপারে তার সাথে কথা বলার সময় এ বিষয়টি খেয়াল রাখবেন যে, আপনি আপনার স্বামীর সাথে কার্যতই চিন্তার আদান-প্রদান করছেন। কারণ, রায় আকর্ষণীয় হওয়ার চাইতে তাতে পারস্পরিক প্রভাব থাকা অধিক শ্রেয়।

- আপনার স্বামীকে বুঝতে দিন যে, সে শান্ত ও কোলাহলমুক্ত এক জান্নাতি পরিবেশে বসবাস করে; যাতে করে সে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে এবং উৎপাদন ও আবিষ্কারের জন্য সময় বের করতে পারে, যা তার জীবনকে করে দেবে সফল ও ফলপ্রসূ।

- সুমিষ্ট ও উপকারী কথা বলতে চেষ্টা করুন। এমন মুচকি হাসি দিন, দেখে যেন মনে হয়, হাসি থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। এমন রসিকতাপূর্ণ আচরণ করুন, যা প্রফুল্লতা এনে দেয় এবং উপভোগ্য হয়। দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি থেকে দূরে থাকুন। বাচালতা ও অহেতুক কথাবার্তা এড়িয়ে চলুন। গোমড়ামুখো ও রূঢ় প্রকৃতির হয়ে থাকবেন না। অবসাদগ্রস্ত ও নিরাশ হয়ে থাকবেন না।

- আপনার স্বামীর সামনে নিজের দক্ষতা নৈপুণ্য ও অন্য সকল নারীর ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তুলুন। আপনি যা জানেন তার সবকিছুই যদি নিপুণভাবে করতে পারেন, তাহলে আপনার প্রতি আপনার স্বামীর আস্থা বেড়ে যাবে এবং আপনার ব্যক্তিগত গুণাবলির প্রতি সে আরো বেশি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। .

- বান্ধবীদের ফোনে অহেতুক কথাবার্তা বলে কিংবা নায়ক-নায়িক ও গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে লেখা বাজে ম্যাগাজিন পড়ে অথবা অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার ঘটনা ও কাল্পনিক গল্পের পেছনে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না। বর্তমানে তো এ জাতীয় ম্যাগাজিনের সংখ্যা খুবই বেশি এবং সেসব নারীর সংখ্যাও অপ্রতুল নয়, যারা এ জাতীয় তুচ্ছ ও নিম্নমানের ম্যাগাজিন পড়ে নিজের সময়ের বিরাট অংশ কাটিয়ে দেয়।

- এমনসব ম্যাগাজিন নির্বাচন করুন, যা আপনার বিবেকবুদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করবে, আত্মার খোরাক জোগাবে, আপনার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করবে এবং সন্তানাদি ও ঘরের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে আপনাকে সহযোগিতা করবে।

- টেলিভিশনের সেসব প্রোগ্রাম বাছাই করুন, যেগুলো আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধির ঝুলি বড় করবে। বাজে সিরিয়াল ও অনর্থক ফিল্ম দেখে সময় নষ্ট করবেন না।

- শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে দেহমনকে প্রাণবন্ত রাখতে আপনার স্বামীকে উৎসাহিত করুন। সম্ভব হলে তার সাথে নিজেও হাঁটুন। সপ্তাহান্তে ছুটি হলে কিংবা যেকোনো সময় সুযোগ পেলে উভয়ে মিলে বিশুদ্ধ বাতাস উপভোগ করুন।

- আপনার স্বামীকে সবসময়ই উপলব্ধি করতে দিন যে, তার আবেগ-অনুভূতি ও সুখে-দুঃখে আপনি তার সাথেই আছেন।

- স্বামীর কাছে পারিবারিক সমস্যা তুলে ধরার জন্য এবং উক্ত সমস্যাবলির সমাধান বিষয়ক আলোচনার জন্য উপযুক্ত সময় নির্বাচন করুন। কারণ, সকালে স্বামী কাজে যাওয়ার আগ মুহূর্তে সময় স্বল্পতার দরুন সমাধান দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সন্ধ্যায় স্বামী যখন ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে ফিরে আসেন, তখন তার সাথে কোনো সমস্যা নিয়েই আলোচনা করবেন না। সম্ভবত সন্ধ্যার পরবর্তী সময়টিই সর্বোত্তম

সময়। এ সময়টিতে সমস্যাও তুলে ধরা যাবে আবার সমাধানের চেষ্টাও করা যাবে। সন্তানদের সমস্যা নিয়ে তাদের উপস্থিতিতে আলোচনা করবেন না। যাতে করে তারা মনে করে যে, তারা আপনার ও আপনার স্বামীর ওপর কঠিন বোঝা এবং তারাই পিতামাতার মাঝে দ্বন্দ্বের কারণ।

- স্বামী ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই বাচ্চাদের চেঁচামেচির মতো সামান্য বিষয়ের অভিযোগ তার দিকে ছুড়ে মারবেন না। তার কাছে এই আবদার করবেন না, তিনি যেন বাচ্চাদের সাথে পুলিশ খেলা খেলেন এবং পুলিশ হয়ে অভিযুক্তকে আটক করে তাকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন কিংবা তাকে মারধর করবেন।

- ছেলেমেয়েদের সামনে আপনার স্বামীর চালচলন নিয়ে সমালোচনা করবেন না। তার শানে এমন কোনো অনুপযুক্ত শব্দাবলি ব্যবহার করবেন না, যা শুনে সন্তানেরা পরবর্তী সময়ে মুখে আওড়াতে থাকে। যেমন বললেন, ভূত এসেছে। অথবা বললেন, বুইড়া বেটা এসে গেছে।

কোনো কোনো মহিলা আছে, যারা নিজের সন্তানকে মুখস্থ করার ক্ষেত্রে অবহেলা করতে দেখলে তাকে বলে, কস্মিনকালেও তুই তোর জীবনে সফল হতে পারবি না। বাপের মতোই তুইও আস্ত একটা অলস ও অকেজো। তার স্বামী অসুস্থ হলে সে তার অসুস্থতার প্রতি তেমন একটা ভ্রুক্ষেপ করে না। স্বামী তার কাছে কোনো গল্প বলতে গেলে সে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমি এটা আগেই শুনেছি। এরূপ আরো অনেক বিষয় আছে, যেগুলো তুচ্ছ ও ছোটখাটো মনে হলেও তার ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে স্বামীর জন্য বহু যাতনা ও যন্ত্রণা।

- সাবধান! সাবধান! অতিরিক্ত ঈর্ষান্বিত হবেন না এবং কথায় কথায় তিরস্কার করবেন না। আবদুল্লাহ ইবনু আবু তালেব তার মেয়েকে অসিয়ত করতে গিয়ে বলেছেন, বেটি! সাবধান! অতিরিক্ত ঈর্ষা করো না। কেননা তা তালাকের চাবি। সাবধান! কথায় কথায় স্বামীকে তিরস্কার করো না। কেননা তা ঘৃণার উদ্রেক করে।

- সাবধান! আপনার শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি স্বামীর ভালোবাসা দেখে আপনি ঈর্ষা করবেন না। কীভাবে আমরা এটি মেনে নিতে পারি যে, একজন মুসলিম রমণী শ্বশুরালয়ের প্রতি স্বামীর ভক্তি-ভালোবাসা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তার জীবন শুরু করতে যাচ্ছে, অথচ এটি এমনই এক জন্মগত ভালোবাসা, যা আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ওপর আবশ্যক করেছেন এবং এ ভালোবাসা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসাকে স্পর্শ করে না; দূর থেকেও না, কাছে থেকেও না! আর কী করেইবা আমরা একজন মুসলিম স্ত্রী থেকে আশা করি যে, সে তার স্বামীর কানে ফিসফিস করে বলবে, স্বামী যেন তার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের

নাফরমানি করে তার সাথে নতুন জীবন শুরু এবং স্ত্রীর মনোতুষ্টির জন্য নিজের পিতামাতার সাথে অবাধ্যতা করবে ও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবে?

ভবিষ্যতে মুসলমানদের অবস্থা ও তাদের আখলাক পরিবর্তন সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যা বলে গেছেন, এটিই হলো তা-ই। সেই যুগ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—স্বামী তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে ও মায়ের অবাধ্য হবে। বন্ধুর প্রতি সদয় হবে ও বাবার প্রতি নির্দয় আচরণ করবে।[৭৪]

- আপনার ঘরের সমস্যার কথা আপনার পরিবারের লোকদের জানাবেন না। অন্যথায় আপনার পরিবারের লোকজনের অন্তর আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে পড়বে। বরং সেসকল সমস্যা স্বামীর সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাধান করুন।

- আপনার স্বামীর ওপর আপনি বড়াই করবেন না, যদিও আপনি তারচেয়ে অধিক ধনী হন কিংবা মর্যাদা ও বংশগত দিক থেকে অধিক উঁচু থাকেন অথবা শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে থাকেন। কেননা, স্বামীকে ছোট জ্ঞান করা তার মর্যাদাকে খাটো করে দেখা এবং তার ওপর বড়াই করা—এসব কিছু জায়েজ নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আল্লাহ এমন নারীর দিকে তাকান না, যে আপন স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, অথচ সে তার থেকে অমুখাপেক্ষী নয়।[৭৫]

- স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণের ক্ষেত্রে আপনি আপনার স্বামীকে বাধা দেবেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—কোনো পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, কিন্তু সে না আসে, আর এতে স্বামী তার ওপর রাগান্বিত হয়ে যায়, তখন ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।[৭৬]

- স্মরণ রাখুন, স্ত্রীর ওপর স্বামীর সর্বপ্রথম হক হলো, স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে। কারণ, নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—আমি যদি কোনো মানুষকে অপর কোনো মানুষকে সিজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে তার স্বামীর প্রতি সিজদা করতে আদেশ দিতাম।[৭৭]

এমনকি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামীর আনুগত্যকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। একবার এক নারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[৭৪] হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহ. বর্ণনা করেন। দেখুন, জামিউল উসুল: ১০/ ৪১০-৪১১

[৭৫] হাদিসটি ইমাম নাসায়ি ইমাম বাজ্জার ও ইমাম হাকেম রহ. বর্ণনা করেন। হাকেম রহ. বলেন, এর সনদ সহিহ।

[৭৬] মুত্তাফাক আলাইহি।

[৭৭] ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করে তাকে সহিহ বলেছেন।

আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! মহিলাদের প্রতিনিধি হয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি। এ জিহাদ আল্লাহ পুরুষদের ওপর ফরজ করেছেন। তারা আহত হলে পুরস্কার পাবে, আর নিহত হলে তারা আল্লাহর কাছে জীবিতরূপে থাকবে, সেখানে তাদের রিজিক দেওয়া হবে। আমরা নারী সমাজ তো এসব পুরুষদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। আমাদের কি এই জিহাদের কোনো সাওয়াব আছে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যেই মহিলার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হয় তার কাছেই আমার এ বাণী পৌঁছে দাও, নারীরা তার স্বামীর আনুগত্য করলে এবং তার হক স্বীকার করলে জিহাদের সমান সওয়াব পাবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক নারীই এটি করে থাকে।'

- আপনার ওপর আপনার স্বামীর অবদান ও অনুগ্রহের কথা ভুলে যাবেন না। কারণ, স্বামীর অবদান ভুলে যাওয়াকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বলে অভিহিত করেছেন এবং এটিকে কুফর বলেও আখ্যা দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলো। তো সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী সেসকল নারীকেই দেখতে পেলাম, যারা কুফর করেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা কী আল্লাহকে অস্বীকার করত? তিনি বললেন, তারা নিজেদের স্বামীদের অস্বীকার করত। তাদের ইহসান ও অনুগ্রহকে তারা স্বীকার করত না। তুমি যদি জীবনভর তাদের কারো প্রতি অনুগ্রহ কর, অতঃপর কোনো এক সময় সে তোমার থেকে ভিন্ন কিছু দেখতে পায়, তাহলে সে বলে উঠবে, আমি তো আপনার কখনোই ভালো কিছু দেখিনি।[৭৮]

- স্বামীর সম্পদের হেফাজত করুন। তার বিনে অনুমতিতে এবং তার সন্তুষ্টির ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে তার কোনো সম্পদ আপনি খরচ করবেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—কোনো নারী যেন তার স্বামীর ঘরের কোনো কিছু তার অনুমতি ছাড়া খরচ না করে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, খাবারও পারবে না? তিনি বললেন, সেটাই তো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ।[৭৯]

- স্বামীর অভাব-অনটন দেখা দিলে আপনি নিজের সম্পদ থেকে তাকে সদকা করুন। আর যদি আপনার সম্পদ না থাকে, তাহলে আপনিও তার সাথে সবর করে কষ্টের জীবন অতিবাহিত করুন। হয়তো আল্লাহ আপনাদের এ কষ্ট দূর করে দেবেন।

---

[৭৮] হাদিসটি ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনা করেন।
[৭৯] হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহ. একটি ভালো সনদে বর্ণনা করেছেন

- স্বামীর অনুমতি ব্যতীত আপনি নফল রোজা রাখবেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—(রমজান ছাড়া অন্য কোনো মাসে) স্বামী উপস্থিত থাকাবস্থায় তার অনুমতি বিনে স্ত্রীর জন্য নফল রোজা রাখা জায়েজ নেই। কোনো নারী যেন স্বামীর অনুমতি না নিয়ে কাউকে তার ঘরে প্রবেশের সুযোগ না দেয়।[৮০]

- আপনার পরিবারের সাথে আপনার সম্পর্ক ও দেখা-সাক্ষাৎকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেবেন না।

- আপনার স্বামীকে তার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করতে বারণ করবেন না। বরং তাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করুন।

- আপনি যদি চাকুরিজীবী মা হয়ে থাকেন, তাহলে এরূপ কল্পনা করবেন না যে, আপনার স্বামীর প্রয়োজনীয় বস্তু একমাত্র অর্থকড়ি। এরূপ মায়েরাই নিজেদের মানবিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও ক্রটি ঢাকতে তাদের ওপর প্রচুর অর্থ খরচ করে। অথচ কৃত্রিম দুধ ও মায়ের আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক দুধ বরাবর হওয়া অসম্ভব, মায়ের আদর-সোহাগের সাথে ঘরের সেবিকার মায়ামমতার এবং পরিপাটি স্ত্রীর রান্নার সাথে সেবিকার রান্নার তফাত কত বেশি। সচেতন মায়ের লালন-পালন আর অজ্ঞ আয়ার লালন-পালন কি কখনো সমান হতে পারে?

- স্বামীর কাজে বিরক্ত হবেন না। কোনো কোনো মহিলার সর্বনিকৃষ্ট কাজ হলো, স্বামীর কাজের প্রতি বিরক্তি প্রচার করে বেড়ানো। এ প্রচার বিভিন্ন পন্থায় হয়ে থাকে। কখনো অভাব-অনটন সৃষ্টি করে। কখনোবা রীতিমতো অভিযোগ-আপত্তি তোলে। কখনো তার প্রতি স্বামীর অবহেলা ও অমনোযোগের অপবাদ দিয়ে। কখনো রাগ করে মায়ের ঘরে আশ্রয় নিয়ে।

- মনে রাখবেন, যেই ঘরের খাবার হলো এক টুকরো রুটি আর পানি, কিন্তু সেখানে শান্তি ও সম্প্রীতি, আরো আছে পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ, সেই ঘর এমন ঘর থেকে হাজার গুণ ভালো, যেখানে বিভিন্ন পদের গোশত ও অধিক সুস্বাদু খাবারের পাশাপাশি ঝগড়াঝাটি ও কামড়া-কামড়িরও কমতি নেই।

- স্মরণ রাখুন, যেই স্বামী এ দৃশ্য অবলোকন করে অভ্যস্ত যে, ঘরের যে মানুষটি সকালে সর্বাগ্রে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তিনি হলেন তার মা, অতঃপর তিনি ঘরের সকলকে ঘুম থেকে জাগান এবং তাদের জন্য সকালের নাশতা তৈরি করেন ও

---

[৮০] হাদিসটি ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনা করেন।

বাচ্চাদেরকে পোশাক পরতে সহযোগিতা করেন, এরূপ স্বামী কখনোই দিনে অর্ধেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে অভ্যস্ত নারীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারে না।[৮১]

৭. আমার স্বামীর খুব রাগ। আমি কী করব?

- আপনার স্বামী যদি রাগী হয়, তার স্বভাব যদি রূঢ় প্রকৃতির হয়ে থাকে, তাহলে আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে।

তার মেজাজ কঠোর হওয়ার কারণ কী, কেনই-বা তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন—তা আপনি খুঁজে বের করুন। সাধারণত বিশেষ কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় কিংবা হতে পারে সে সুখী ও স্থিতিশীল শৈশব উপভোগ করতে পারেনি। সাধারণত শৈশবে যারা আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চিত থাকে, তারাই উত্তেজিত ও কঠোর স্বভাবের হয়ে থাকে। তাই আপনি আপনার স্বামীর প্রতি নিজের ভালোবাসা মায়া-মমতা ঢেলে দিন।

আপনার স্বামী আপনার কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান, তা স্মরণ করুন এবং তাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করুন যে, আপনি তার জীবনের আলো। তবে এসব করতে গিয়ে নিজেকে ভুলে যাবেন না। ভুলবেন না নিজের অস্তিত্বকেও।

- স্বামীর উত্তেজিত অবস্থার আচরণ দেখে আপনিও উত্তেজিত হয়ে যাবেন না। সুতরাং স্বামী হইচই করলে আপনিও কিন্তু হইচই করবেন না। স্মরণ রাখবেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সম্পর্ক।
- স্বামী জনসম্মুখে কোনো ভুল করলে আপনি তার ভুল ধরতে যাবেন না। আবার তাকে এ ভুল চালিয়ে যেতে উস্কানিও দেবেন না। বরং এ স্থানে আপনি নীরবতা পালন করুন।
- স্বামীর ছোটখাটো ভুলের কারণে আপনার হৃদয়ের গহিনে তার চিত্র বিকৃত করে রাখবেন না।
- আপনি আপনার মেধা, বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসা কাজে লাগিয়ে স্বামীর দোষগুলো বের করুন এবং একে একে এসব দোষক্রটি থেকে মুক্ত হয়ে বদভ্যাসের পরিবর্তে ভালো ও উন্নত অভ্যাসগুলো অর্জন করতে তাকে অনুপ্রাণিত করুন।
- স্বামী আচার-আচরণে পেরেশানি ও অস্থিরতায় অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করতে যাবেন না। কারণ, আপনার তিরস্কার ও নিন্দা আপনার স্বামীর কোনো উপকার

[৮১] ড. রমজান হাফেজ রচিত 'কাইফা তুসিঈদিনা জাওজাকি ও তুহাফিজিনা আলাইহি' গ্রন্থ নেওয়া হয়েছে।

তো করবেই না। উলটো এতে করে উত্তেজনাপূর্ণ আচরণের প্রতি তার জেদ ও একগুয়েমি আরো বেড়ে যাবে।

- স্বামীর অভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি সাধন করুন। তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলুন। তার শ্রেষ্ঠত্ব কুরবানি ও অপরের জন্য তার সহযোগিতার কথা বেশি করে বলুন। এর দ্বারা তার নেতিবাচক মানসিকতা হ্রাস পাবে এবং ইতিবাচক মানসিকতা বৃদ্ধি পাবে।
- জীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে এবং জীবন নিয়ে আশাবাদী হওয়ার ব্যাপারে আপনি আপনার স্বামী ও সন্তানদের জন্য উত্তম আদর্শে পরিণত হোন।
- স্বামীর সাথে যদি আপনি ঝগড়া করেন কিংবা স্বামী যদি আপনার ওপর রেগে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুশি করতে তোড়জোড় শুরু করুন। এটি ভেবে বসে থাকবেন না যে, ভুল তো তিনিই করেছেন। সুতরাং তার কর্তব্য হলো, আমার কাছে এসে আমাকে খুশি করা।

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতি রমণীদের কথা বলব না?

উপস্থিত সাহাবিগণ বললেন, অবশ্যই, আপনি আমাদের বলুন।

তিনি বললেন, প্রত্যেক এমন স্বামীভক্ত ও অধিক সন্তান জন্মদানকারিণী নারীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে যে, যদি তাদের ক্ষেপিয়ে তোলা হয় কিংবা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয় অথবা তাদের স্বামী রেগে যায়, তখন তারা বলে, আমার হাত আপনার হাতের মধ্যে রাখলাম। আপনি খুশি না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না।[৮২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন—যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে, তার জন্য বৈধ হবে না স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার ঘরে কাউকে আসতে দেওয়া এবং তার অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের হওয়া। অনুরূপভাবে তার ঘরে কারো আনুগত্য করা, স্বামীর বিছানা ছেড়ে চলে যাওয়া এবং তার কোনো ক্ষতি করাও বৈধ নয়। সুতরাং স্বামীর অন্যায় বেশি থাকলে স্ত্রী যেন তার কাছে গিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। স্বামী যদি স্ত্রীর ওজর গ্রহণ করে, তাহলে তো তা ভালো হবে। আল্লাহও তার ওজর কবুল করে নেবেন এবং তার কৈফিয়ত কার্যকর হবে। তার ওপর আর কোনো গুনাহ থাকবে না। আর যদি স্বামী তা গ্রহণ না করে, তাহলে তো সে

[৮২] হাদিসটি ইমাম তাবারানি রহ. বর্ণনা করেন।

আল্লাহর কাছে তার ওজরের কথা পৌঁছিয়ে দিয়েছে। (সুতরাং সে দায়মুক্ত হয়ে গেছে।)[৮৩]

যদি তিরস্কার ও ভর্ৎসনার প্রয়োজন হয়, তাহলে ঠান্ডা হওয়ার পর ভর্ৎসনা করা যাবে। তবে শর্ত হলো, তা হবে শান্ত ও হাসিখুশি অবস্থায় এবং উপযুক্ত সময়ে। তবে এতে মনে যেন কোনো সংকীর্ণতা, ঘৃণা ও তিক্ততার সৃষ্টি না হয়।

৮. আমি দ্রুত ক্ষেপে যাই, কী করতে পারি?

অতি তুচ্ছ ও নগণ্য কারণে আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না এবং অতি উত্তেজিত হবেন না। উত্তেজিত হলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন এবং ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলুন।

- ক্রোধের সময় অন্যসব বিষয়ের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন; যাতে আপনার উত্তেজনা বিক্ষিপ্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে উড়ে যায়।
- আপনার ক্রোধকালীন শক্তি ভালো কোনো কাজে ব্যয় করুন। যেমন উদ্যমের সাথে দাঁড়িয়ে যান অথবা ঘর সাজান কিংবা জামা সেলাই করুন বা অন্য যেকোনো উপকারী ও উদ্যমী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন।
- আপনার দৃষ্টি আপনি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিন। অতঃপর কাউকে দেখতে অপছন্দ হলে কিংবা কারো প্রতি ক্রুদ্ধ হলে তার মধ্যে এমন কোনো কারণ খুঁজে বের করুন, যার দরুন আপনার ঘৃণা দূর হয়ে যাবে এবং আপনি তার প্রতি মুগ্ধ হবেন। এভাবেই তার প্রতি আপনার গোস্বা ও বিদ্বেষ থেকে আপনি নিষ্কৃতি পাবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

ولا تبخسوا الناس أشياءهم

তোমরা মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না। [সুরা শুআরা, আয়াত : ১৭৩]

- নিজের কোনো দোষ অনূভুত হওয়া কারণে আপনি যদি নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হন, তাহলে আপনি সেসকল গুণ, প্রতিভা ও সৌন্দর্য তালাশ করুন, যা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন এবং যা আপনার চোখে আপনার মর্যাদা উঁচু করে দেবে। এভাবেই আপনি নিজের দোষ অনুভব করা থেকে রক্ষা পাবেন।

---

[৮৩] ইমাম হাকেম রহ. হাদিসটি বর্ণনা করে এর সনদকে সহিহ বলেছেন।

- ক্রোধের সময় গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন না। বরং ক্রোধের তীব্রতা ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। অতঃপর ঠান্ডা ও শান্ত হলে বিষয়টি নিয়ে পুনরায় ভাবুন।
- যে সকল বিষয় আপনাকে উত্তেজিত করে তোলে, সেগুলো থেকে বিরত থাকুন।
- ক্রোধের অশ্রু আটকে রাখবেন না এবং এ সময় নিজের কান্না থামিয়ে দেবেন না। (তবে অতিরিক্ত কান্না করা যাবে না।) কারণ, এ কান্না আপনার মধ্যে শান্তি ও স্থিরতা ফিরিয়ে আনবে এবং আপনার স্নায়ুগুলোকে প্রশান্ত করবে।

প্রবাহিত অশ্রু আপনাকে রাগ ও অভ্যন্তরীণ দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু অশ্রু আটকিয়ে রাখলে তা আস্তে আস্তে ফুলে উঠবে এবং এমন রোগ হয়ে বেরিয়ে আসবে, যা আপনার আত্মাকে আঘাত করবে এবং আপনাকে ওলট-পালট করে ছাড়বে।

- আল্লাহ তাআলার প্রতি নিজের ঈমান ও বিশ্বাস বাড়িয়ে তুলুন এবং মনে মনে সর্বদা নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে থাকুন—

فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا

নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে। কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে। [সুরা আলাম নাশরাহ, আয়াত : ৫-৬]

৯. স্বামী-স্ত্রীর শরিকানা দায়িত্বাবলি

এমন কিছু কাজ আছে, দায়িত্বের খাতিরে যেগুলো স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই করতে হয়। তেমনই কিছু দায়িত্ব এখানে আলোচিত হলো।

- সন্তানদের ইসলামি ছাঁচে গড়ে তোলা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দায়িত্ব। তবে শিশুদের জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর এই দায়িত্বের বিরাট অংশ স্ত্রীকেই পালন করতে হয়। এ সময় স্বামীর কর্তব্য হলো, এ কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করা। অতঃপর যখন সন্তানরা বড় হবে, তখন স্বামী তার পূর্ণ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবে।
- স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেরই অপরের ওপর হক হলো, তাদের প্রত্যেকেই অপরের সম্মান ও নিজেদের সন্তানদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে চলবে। আর তা সম্ভব হবে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত আয়াতের ওপর আমল করলে। তিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات أعد الله لهم مغفرة و أجرا عظيما.

আর যে সকল নারী ও পুরুষ নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে এবং যে সকল পুরুষ ও নারী অধিক জিকির করে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। [সুরা আহজাব, আয়াত : ৩৫]

এ কারণেই স্ত্রীর কর্তব্য হলো, স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে তার ঘরে ঢুকতে না দেওয়া, তার সন্তুষ্টি বিনে কাউকে তার বিছানা গোছগাছ করতে না দেওয়া এবং কোনো পুরুষের সাথে সাক্ষাৎ না করা। তবে প্রয়োজন দেখা দিলে তার অনুমতি সাপেক্ষে সাক্ষাৎ করতে পারবে। সেক্ষেত্রেও সাক্ষাৎকালে ইসলামি পোশাক পরিধান করতে হবে। একইভাবে স্বামী-স্ত্রীর সকলের জন্যই নিজের মাহরাম ছাড়া কারো সাথে নির্জনে সময় কাটানো হারাম।

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—সাবধান! তোমরা মহিলাদের কাছে প্রবেশ করবে না। এক আনসারি সাহাবি বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ, স্বামীর নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, তারা মৃত্যুতুল্য।

স্বামীর নিকটাত্মীয় বলতে উদ্দেশ্য হলো, তার ভাই, ভাতিজা চাচা প্রমুখ। তো স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর সাথে এদের দেখা দেওয়া এবং তাদের সাথে স্ত্রীর নির্জনে সময় কাটানোকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে তার মাহরাম ছাড়া নির্জনে সময় না কাটায়।[৮৪]

- স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেই অপরের জন্য সাজগোজ করা আবশ্যক। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার স্ত্রীর জন্য সাজসজ্জা করতে পছন্দ করি, যেরূপ আমি পছন্দ করি, সে-ও আমার জন্য সাজসজ্জা করুক।
- স্ত্রীর ওপর যেমন আবশ্যক, তার স্বামী তার জন্য যতটুকু রিজিকের ব্যবস্থা করতে পারে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা। তেমনি স্বামীরও কর্তব্য হলো তার স্ত্রী তার জন্য যতটুকু আরামের ব্যবস্থা করতে পারে, ততটুকুর ওপরই রাজি থাকা। সুতরাং কেউ কাউকে অতিরিক্ত কষ্ট চাপিয়ে দেবে না।

[৮৪] হাদিসটি ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন।

- যদি স্ত্রীর কর্তব্য হয়ে থাকে এমন সকল বিষয়ে স্বামীর কথা শোনা এবং মান্য করা, তাহলে স্বামীরও কর্তব্য হলো, এমন সকল ব্যাপারে নিজ স্ত্রীর কথা শোনা ও মান্য করা, যার কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন না এবং পরিবারেরও ক্ষতি হয় না। কারণ, স্বামী-স্ত্রীর উদ্দেশ্য যখন এক ও অভিন্ন—আর তা হলো, কথায় ও কাজে আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখার পাবন্দি করার সাথে সাথে নিজেদের উভয়ের জন্যই সুখ নিশ্চিত করা—তখন তো তাদের কর্ম এবং চিন্তাভাবনাও এক ও অভিন্ন হবে। ফলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হবে, যেন তাদের প্রত্যেকেই হুবহু সেই কাজটি আঞ্জাম দিচ্ছে, যা অপরজন চেয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তাদের উদাহরণ হবে একই দেহের অঙ্গসমূহের মতো।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সর্বপ্রথম যে অনৈক্য দেখা দিতে পারে, তা তখনই সংগঠিত হয়, যখন তাদের কোনো একজন নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনে পাবন্দি করে না। এই খেয়ালখুশির অনুসরণ বর্জন করে আল্লাহর দিকে অভিমুখী হওয়ার সাথে সাথে অতি সহজেই সেই অনৈক্য ও বিভেদ দূর হয়ে যাবে।

- যে সকল স্থানে স্বামীর চোখ পড়ে এবং নাক লাগে, সে জায়গাগুলো খুঁজে বের করা যদি স্ত্রীর কর্তব্য হয়ে থাকে, তাহলে স্বামীর চোখ যেন তার কোনো মন্দ বিষয়ের ওপর না পড়ে; চাই তা নিজের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে হোক কিংবা ঘরের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে। আর তার নাক যেন শুধু অতি সুগন্ধময় ঘ্রাণ পায়; চাই তার নিজের মধ্যে হোক কিংবা তার ঘরের মধ্যে হোক। অনুরূপভাবে স্বামীরও কর্তব্য হলো, তার স্ত্রীর দৃষ্টি পড়ার জায়গা এবং নাক লাগার স্থানসমূহ খুঁজে বের করা। সুতরাং স্ত্রীর দৃষ্টি যেন তার মন্দ কোনো বিষয়ের ওপর না পড়ে; চাই তার সৌন্দর্যের বেলায় হোক কিংবা তার কাজ ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে হোক। আর তার নাকে যেন কেবল স্বামীর উত্তম সুগন্ধিই লাগে। এর কারণ হলো, স্ত্রী স্বামীর শান্তি আর স্বামীও স্ত্রীর জন্য শান্তি। তাকে দেখে সে প্রশান্তি লাভ করে।

স্বামী যদি আল্লাহকে ভয় করে এবং আপন কাজকর্মে তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে সেটাই হবে স্ত্রীর জন্য উত্তম ও হালাল রিজিক। আর সে যদি সুন্নাহকে পালন করে খেলাধুলা ও রসিকতা করে, তাহলে সেটাই হবে স্ত্রীর সুখ, যার কারণে তার চিত্ত প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

- স্ত্রীর ওপর যদি আবশ্যক হয় তার স্বামীর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা; কারণ, তার সম্পদই হলো তার রিজিক এবং তার পরিবারের রিজিক, যা হেফাজত করা ওয়াজিব এবং অপচয় করা হারাম, তাহলে স্বামীর ওপরও স্ত্রীর মতো নিজের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা অপরিহার্য। সুতরাং স্বামী যেন তার সম্পদ শুধু আল্লাহর আদেশ মোতাবেক খরচ করে এবং নিজের পরিবারের ওপর খরচ করে। তাদের

কোনো ব্যাপারে যেন সে উদাসীন না থাকে এবং তাদের কোনো কাজ যেন সে উপেক্ষা না করে।

- স্ত্রীর জন্য যদি জরুরি হয় তার স্বামী চিন্তিত ও পেরেশান থাকলে তার সম্মুখে আনন্দ না করা আর খুশি ও প্রফুল্লমনা থাকলে তার সামনে কোনো দুঃখের কথা না উঠানো, তাহলে তো স্বামীর জন্য এ বিষয়টি লক্ষ রাখা আরো অধিকতর সমীচীন ও অতীব জরুরি। সুতরাং স্ত্রী পেরেশান ও চিন্তিত থাকলে, সে-ও যেন তার সামনে উল্লাস না করে আর খুশি থাকলে তার সামনে দুঃখের বিষয় না আনে।
- ঈর্ষান্বিত হওয়া এবং কথায় কথায় তিরস্কার করা যদি স্ত্রীর ওপর অপরিহার্য হয়, তাহলে তা স্বামীর ওপর আরো অধিক অপরিহার্য। কেননা সে তার মনের জিদ ও একগুয়েমি নিয়ন্ত্রণ করতে অধিক সক্ষম।
- যখন স্ত্রীর দায়িত্ব হলো, সে তার স্বামীর জন্য স্ত্রীও হবে আবার একজন মায়ের ভূমিকাও পালন করবে, তখন তো স্বামীরও দায়িত্ব হলো, তার স্ত্রীর জন্য সে স্বামীও হবে আবার একজন বাবার ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হবে। কারণ, সেই তো তার জীবনের সবকিছু এবং তার ভবিষ্যৎ ও তার পরিবারের কর্তা।
- নিজ পরিবারের দেখাশোনা করা এবং কাজেকর্মে আল্লাহকে ভয় করার যে আদেশ আল্লাহ্ স্বামীকে দিয়েছেন, তা বাস্তবায়নের জন্য তাকে সতর্ক করা যেমন স্ত্রীর জন্য জরুরি, তেমনি আপন রবের আনুগত্য করা এবং নিজ পরিবারের দেখভাল করার জন্য আল্লাহ তাআলা স্ত্রীকে যে নির্দেশ করেছেন, তা বাস্তবায়নের জন্য তাকে নির্দেশনা প্রদান করাও স্বামীর জন্য জরুরি।[৮৫] আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها لانسئلك رزقا نحن نرزقك و العاقبة للتقوى .

আপনি আপনার পরিবারকে নামাজের আদেশ করুন এবং এর ওপর সবুর করুন। আমি তো আপনার কাছে কোনো রিজিক চাই না। আমিই তো আপনাকে রিজিক দান করি। আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই। [সুরা ত্বহা, আয়াত : ১৩২]

---

[৮৫] উস্তাদ মাহমুদ আস-সাব্বাগ রচিত আস-সাআদতুজ জাওজিয়্যাহ ফিল ইসলাম।

- স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের ওপর আবশ্যক হলো নিজেদের স্বামী-স্ত্রী সুলভ বিশেষ গোপন বিষয় ফাঁস না করা। এগুলো তাদের পরস্পরের আমানত। এগুলো ফাঁস করে দেওয়া খেয়ানত।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ—কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে অতি নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে সেই লোকটিও থাকবে, যে নিজের স্ত্রীর কাছে যায় এবং তার স্ত্রীও তার কাছে আসে। অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপন বিষয় প্রচার করে দেয়।[৮৬]

- স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই জানা উচিত যে, বৈবাহিক সুখ স্থায়ী হওয়ার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, উত্তম বন্ধুত্ব। অর্থাৎ ঘনিষ্ঠতা ও সহযোগিতা। এর পর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রত্যেকেরই অপরের রুচি ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। অতঃপর সঠিক আখলাকের সাথে লেগে থাকা এবং একে অপরের জন্য কুরবানি করা এবং এত অধিক সহযোগিতা করা, যা একজনকে অপরজনের কাছে নিয়ে যায়। চাই তা একট টুকরো রুটির ক্ষেত্রে হোক বা মাথায় ঘুরতে থাকা কোনো চিন্তার ক্ষেত্রে।

[৮৬] হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন।

শেষ অধ্যায়

হতাশা ও দুশ্চিন্তা

১. হতাশা ও দুশ্চিন্তার উৎস

আপনি যদি সুখী না হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার দূর অতীতে ফিরে গিয়ে গবেষণা করুন। হয়তো আপনার সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ শৈশবকালের কোনো ব্যর্থতা। যার ফলেই আপনি এখন মানুষকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে কিংবা তাদের বিতাড়নের মধ্যেই সুখ খুঁজে পান।

এ অবস্থার সর্বোত্তম চিকিৎসা হলো, আপনি আপনার মনকে বলুন, তুমি তো উপেক্ষিত নও। অন্যদের মতো তোমার জীবনেরও একটা বার্তা আছে। সমাজ তোমার দিকে চেয়ে আছে, যেরূপ অন্যদের দিকে চেয়ে আছে। ভবিষ্যতে সমাজ তোমার প্রয়োজনই সর্বাধিক অনুভব করবে। মনে মনে এসব বললে তখনই আপনার হৃদয়ের গভীরে আপনি যে আশাবাদ ও আনন্দ অনুভব করছেন, তা বেড়ে যাবে এবং আপনার থেকে তা তাদের প্রত্যেকের কাছেই চলে, যার সাথেই আপনার সাক্ষাৎ হবে।

আপনার ভেতরের সেই আওয়াজ থেকে আপনার কানকে বধির করে রাখা উচিত, যে আওয়াজ আপনাকে ফিসফিস করে বলে, তুমি একটা ব্যর্থ লোক। কেউ তোমার অস্তিত্বকে ভ্রুক্ষেপ করে না। তোমার বন্ধুরা তোমার থেকেও ভালো ও বুদ্ধিমান এবং তারা অধিক সফলও। তারা সকলেই তোমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করে।

কোনো এক বড় মনোবিজ্ঞানী বলেছিলেন, পোলিক্রেটসের বিশ্বাসই ছিলো তার সুখের সবচেয়ে বড় শত্রু ভবিষ্যৎ।

দুই হাজার বছরেরও অধিককাল আগে এই পোলিক্রেটস ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক। ভাগ্য তার সাথে যেন বন্ধুত্ব পেতেছে। তাই তো সফলতা সম্পদ ক্ষমতা ও পদমর্যাদার সকল উপকরণ ছিল তার হাতের মুঠোয়। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিল ভীষণ

শঙ্কিত। সে বিশ্বাস করতো, দেবতারা তাকে দুহাত ভরে এ সকল নিয়ামত এ জন্যই দান করেছেন যে, একসময় হঠাৎ তার থেকে এসব ছিনিয়ে নেবে এবং তাকে কষ্ট দেবে ও তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করবে। এ অবস্থা দেখে তার এক ঘনিষ্ঠ লোক তাকে পরামর্শ দিলো, আপনি দেবতাদের নামে কিছু উৎসর্গ করুন। পরামর্শমতে শাসকও কুরবানির জন্য বিশাল এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সে তার সবচেয়ে মূল্যবান আংটিটি গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। অতঃপর এক সামুদ্রিক শোভাযাত্রার মাধ্যমে সে তীরে ফিরে আসে। যেই সে দুপুরের খাবার খেতে বসেছে, তখনই তার সামনে রাখা ভুনা করা মাছের পেটে সেই আংটিটি দেখতে পেল, যা সে কিছুক্ষণ আগেই সমুদ্রে ফেলে এসেছিল। এ আংটি দেখামাত্রই তার ভয় ও আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। কারণ, সে এখন বিশ্বাস করে নিয়েছে, দেবতারা তাকে কষ্টে নিপতিত করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করেছে বিধায় তার এই কুরবানি কবুল করেনি। শত্রুরা তার এই হতাশা ও চরম পেরেশানির মুহূর্তটিকে লুফে নেয়। তারা তার ওপর আক্রমণ করে তার সিংহাসন গুঁড়িয়ে দেয়।

এই মনোবিজ্ঞানী বলেন—পোলিক্রেস্টের মতো বহু মানুষ এখনো আছে। তাদের কাছে সুখের সমুদয় উপকরণ আছে। কিন্তু এর পরও তারা চেনে না সুখ, শান্তি ও আরাম কি জিনিস? কারণ, তারা ধারণা করে, ভাগ্য তাদের সবচাইতে দামি বস্তু তাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে অপেক্ষায় আছে। এভাবেই তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর দুঃখ-কষ্ট, অনিদ্রা, মাথাব্যথা, হজম না হওয়াসহ অসংখ্য শারীরিক রোগের জন্ম দেয়, যা মূলত মানসিক অস্থিরতা থেকে উদ্ভূত। আর তখনই তারা হয় অসুখী ও দুর্ভাগা।

২. দুশ্চিন্তা থেকে কীভাবে মুক্তি পাবেন?

হতাশা ও দুশ্চিন্তা এমনই এক ব্যাপক অবস্থা, প্রতি ২৫ জনের একজন এতে আক্রান্ত। বরং কোনো কোনো পরিসংখ্যান মতে প্রতি পাঁচজনের একজন জীবনের কোনো না কোনো সময় এই হতাশায় আক্রান্ত হয়।

দুঃখ কষ্ট একাকিত্ব অসন্তুষ্টি ও বিষণ্ণতা অনুভব করার নামই হচ্ছে হতাশা ও দুশ্চিন্তা।

এই সকল অনুভূতি মানুষের মধ্যে বাস্তবেই দেখা দেয়, যখন সে কঠিন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় কিংবা জীবনে নির্দিষ্ট কতগুলো ভুল করেছে বলে তার মনে হয়।

এ সকল অবস্থাতেই আমরা কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও কিছুটা হতাশায় ভুগি। যেসকল কঠিনতম মুসিবত মানুষের মধ্যে হতাশার অনুভূতি সৃষ্টি করে, প্রিয় কোনো বস্তু হারানো তেমনই একটি কঠিনতম বিপদ। তাই যখনই ঐ জাতীয় কোনো অনুভূতি দেখা দেবে আর সেটি যদি হয় অনেক কঠিন ও দীর্ঘ সময় চলমান, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। আপনি যেসকল মানসিক চাপ ও কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলোর

মোকাবিলা করার জন্য সম্ভবত মানসিক চিকিৎসাই আপনার সবচেয়ে বড় উপকার করবে।

দুশ্চিন্তা ও হতাশায় আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হলো, নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশেষ নির্জনতায় আবদ্ধ করে ফেলা। কারণ, দুঃখ-কষ্টের অনুভূতিকালে জনবিচ্ছিন্ন থাকলে সেই অনুভূতির প্রকোপ আরো বেড়ে যায় এবং মানুষদের থেকে দূরে থাকা ও নিজেকে ঘরবন্দি করে রাখলে কষ্টের ওপর কষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাই এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো, চিন্তা ও হতাশার নৌকায় ঘোরাঘুরি করে দীর্ঘ সময় কাটানোর চেয়ে নিজের শক্তি এমনসব ইতিবাচক কাজে ঢেলে দেওয়া, যা চিন্তাশক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে।

এটি হলো অসংখ্য মানুষের জীবনে স্বাভাবিক ও সাধারণ যে দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেয় সে সম্পর্কে। কিন্তু ক্লিনিক্যাল বিষণ্ণতা পূর্বের আলোচিত বিষণ্ণতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। এ প্রকারের বিষণ্ণতা নির্দিষ্ট কোনো মুসিবত কিংবা ঘটনাকে কেন্দ্র করে হয় না। বরং এটি একটি রোগ, যা জীবনের নানা স্তরে বারংবার হতে পারে। আর তা সেই অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত, যা কোনো প্রিয় বস্তু হারানোর পর কিংবা জীবনের কঠিন কোনো পরিস্থিতিতে পড়ার পর তৈরি হয়।

বিষণ্ণতার রোগের সাথে যেই অনুভূতি সৃষ্টি হয়, সেটি কখনো কখনো উল্লিখিত অবস্থার সমপর্যায়ের হতে পারে। বরং কখনো কখনো তো তার চেয়ে অধিক কঠিন ও কষ্টদায়ক হতে পারে।

ক্লিনিক্যাল বিষণ্ণতায় আক্রান্ত রোগী চরম দুঃশ্চিন্তায় ভোগে এবং এমন বিরক্তিকর বিষণ্ণতা অনুভব করে, যা তার নিজেকে মূল্যায়ন করা থেকে শুরু করে অতীতের কোনো ঘটনার দিকে তাকানো পর্যন্ত জীবনের সবকিছুতে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি অতীতের একটি সুখকর ঘটনাও স্মরণ করতে পারে না। আর এই প্রভাব ভবিষ্যৎ পর্যন্ত গড়ায়। ফলে সে নিজেকে এমন মূল্যহীন মনে করে, যার না আছে কোনো আশা আর না আছে কোনো স্বপ্ন। বিষণ্ণতার দরুন দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও সবকিছু থেকে নিরাশা তার ওপর ঝেঁকে বসে।

এ সবকিছুর সাথে যুক্ত হয় পেরেশানি ভয় ও হতবুদ্ধিতার অনুভূতি।

এই ক্লিনিক্যাল বিষণ্ণতার রোগে যারা আক্রান্ত, তাদের কেউ কেউ হয়তো এমন কিছু কারণ অনুসন্ধান করে, যেগুলো তাদের জীবনে ঘটেছে, ফলে তারা এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। কখনো তারা এমন কতক কারণ পেয়েও যায়, যেখান থেকে এ সকল অনুভূতির সূচনা বলে তারা দাবিও করে। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, এ অবস্থার রয়েছে বহু বায়োলোজিক কারণ।

ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করে। ছোট বড় প্রতিটি বিষয়ের জন্যই তারা নিজেদেরকে দোষারোপ করে। নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তারা অনুভব করে যে, তারা কোনো কাজ করতেও সক্ষম নয় এবং কোনো কিছু দিতেও সামর্থ্য রাখে না। এর সাথে আবার যুক্ত হয় কঠিন কষ্ট ও ক্লান্তি। এমনকি এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ভাবতে শুরু করে, সে শারীরিক রোগেও আক্রান্ত।

এ অনুভূতি সকাল হলে আরো বেড়ে যায় এবং আক্রান্ত ব্যক্তির ঘুম ও খাবারদাবার উলটপালট হয়ে যায়। তাই তো তাদের কেউ কেউ সকল খাবারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। একই সময়ে আবার কেউ কেউ খাবারের মধ্যে ডুবে থাকে।

ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনে আক্রান্ত ব্যক্তি পূর্বে যেসকল বিষয় উপভোগ করতো, সেগুলোর প্রতি তার আর আগ্রহ থাকে না। কোনো কিছুতেই সে আনন্দ ও তৃপ্তি পায় না।

ক্লিনিক্যাল বিষণ্ণতার কয়েকটি স্তর রয়েছে। কখনো তা এতটাই হালকা হয় যে, আক্রান্ত ব্যক্তি এ অবস্থায়ও নিজের জীবনকে এমনভাবে যাপন করতে পারে, যা স্বাভাবিক জীবনযাপনের কাছাকাছি। আবার তা কখনো এত অধিক কঠিন হয়ে থাকে যে, সে জীবনের প্রতিই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বরং কখনো তো এর সাথে আত্মহত্যার চিন্তাও মাথায় আসে।

মানুষের জন্য জানা অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে, হতাশা ও পেরেশানি অত্যন্ত নিরাময়যোগ্য একটি রোগ। এক্ষেত্রে সবসময়ই নিরাময়ের আশা করা যায়। এমনকি হতাশার সবচেয়ে নাজুক অবস্থায়ও। সুতরাং যখনই পেরেশানি ও হতাশা কাউকে আক্রান্ত করে বসবে, তখন তার জানা উচিত যে, এর চিকিৎসা কঠিন কিছু নয়। এমন বহু ওষুধ আছে, যা দিয়ে পেরেশানির অবস্থাসমূহের চিকিৎসা করা যায়। এ সকল ওষুধ মস্তিষ্কের মধ্যে থাকা কিছু বিষয়ের রাসায়নিক ভারসাম্যের কারণে সৃষ্ট গণ্ডগোল ঠিক করে দিয়ে। আর এই রাসায়নিক গণ্ডগোলটিই মূলত পেরাশানি ও হতাশার রোগে আক্রান্ত হওয়ার নেপথ্য কারণ।

কঠোর শারীরিক অনুশীলনও কখনো কখনো পেরেশানির বোঝা লাঘবকরণে উপকার করে। কারণ, মাংসপেশিতে অধিক পরিমাণে পরিশ্রম হলে মস্তিষ্কের কিছু রাসায়নিক উপাদান ঠিক হয়ে যায়। এতে মেজাজও ভালো হয়ে যায়।

বিষণ্ণতার বিষয়টি কখনো পরিবারের সদস্য কিংবা বন্ধুদের কাছে অস্পষ্ট থাকে। ফলে তারা আপনাকে বলে, আপনি যেন আপনার শৃঙ্খল থেকে তৎপরতার সাথে উঠে দাঁড়ান এবং যে পেরেশানিতে আক্রান্ত তার জন্য কিছু একটা করেন। এ কারণেই এ ব্যাপারে ভালোভাবে বোঝা উচিত যে, ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন একটি শারীরিক রোগ। এর উদাহরণ অন্যান্য রোগের মতোই। মস্তিষ্কে বিদ্যমান কিছু বিষয়ে রসায়নগত গণ্ডগোলের ফলেই এ

রোগের সৃষ্টি হয়। এ বিষণ্ণতা সৃষ্টিতে আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো অপরাধ নেই। সুতরাং পরিবারের লোকজন যেন তাকে তিরস্কার কম করে। কেননা, আক্রান্ত ব্যক্তি যা অনুভব করে, তা সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং পরিবর্তন করার সামর্থ্যও রাখে না। এই অনুভূতি সৃষ্টির পেছনে আক্রান্ত লোকটির কোনো দোষ নেই।

৩. সুদৃঢ় ঈমানের ভূমিকা

মজবুত ঈমান হতাশা ও বিষণ্ণতার সর্বোত্তম চিকিৎসা। যেমন তা হতাশার ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ।

জার্মানের মনোবিজ্ঞানী ড. ফ্রাঙ্ক লোবাখ বলেন—আপনার একাকিত্বের অনুভূতি যত বেশিই হোক আপনি জেনে রাখুন, আপনি কখনোই একা নন। আপনি রাস্তার কোনো একপাশে থাকেন, তাহলে এই বিশ্বাস নিয়ে চলতে শুরু করুন যে, আল্লাহ আপনার সাথেই আছেন।

নববর্ষকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে এক পশ্চিমা সাহিত্যিক বলেন, নতুন বর্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটিকে আমি বললাম, আমাকে একটু আলো দাও। আমি এর সাহায্যে পথের অন্ধকার দূরীভূত করে তাতে আলো ছড়াব। সে উত্তর দিলো, আপনার হাতটি আল্লাহর হাতে রাখুন। তিনিই আপনাকে সরল পথের দিশা দেবেন।

সেই ব্যক্তি কী করে একাকিত্ববোধ করতে পারে, যে আপন রবের পবিত্র কিতাবে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে—

و لله المشرق و المغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم

পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই মালিকানাধীন। সুতরাং তোমরা যেদিকেই মুখ করো, তা আল্লাহর দিক। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞানী। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১১৫]

هو الذي خلق السموات و الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
يعلم ما يلج في الأرض و ما يخرج منها و ماينزل من السماء و
مايعرج فيها و هو معكم أينما كنتم و الله بماتعملون بصير.

তিনিই সেই সত্তা, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে ইস্তিওয়া গ্রহণ করেছেন। তিনি জানেন, যা জমিনে প্রবেশ করে এবং যা জমিন থেকে বের হয়। যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়

এবং যা তাতে আরোহণ করে, তা-ও তিনি জানেন। আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা করো, তা তিনি ভালো করেই দেখতে পান। [সুরা হাদিদ, আয়াত : ৪]

যে কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে, সে তো কেবল তাই অনুভব করবে, যা মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে নিম্নোক্ত কথা বলার সময় অনুভব করেছে—

إن معي ربي سيهدين

আমার রব আমার সাথেই আছেন। তিনি আমাকে অবশ্যই পথ দেখাবেন। [সুরা শুআরা, আয়াত : ৬২]

অনুরূপভাবে নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় তাঁর সাথি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ কথা বলার সময় যা অনুভব করেছিলেন—

لاتحزن إن الله معنا

আপনি চিন্তা করবেন না। আল্লাহ তো আমাদের সঙ্গেই আছেন। [সুরা তাওবা, আয়াত : ৪০]

বৈবাহিক সুখ অনেকটা মৌচাকের মতো। দুটি মৌমাছি মিলে সেটা তৈরি করে। এ মৌচাক তৈরিতে তাদের পরিশ্রম যত বেশি হবে, তাতে মধুর স্বাদও হবে তত বেশি।

চারটি বিষয় সুখের প্রধানতম অবলম্বন। ১. নেককার স্ত্রী ২. প্রশস্ত বাসস্থান ৩. সৎ প্রতিবেশী ৪. আরামদায়ক বাহন। আর চারটি বিষয় অশান্তি ও দুঃখের কারণ। ১. খারাপ স্ত্রী ২. অসৎ প্রতিবেশী ৩. খারাপ বাহন ৪. সংকীর্ণ বাসস্থান। [সূত্র: ইমাম হাকেম এবং বাইহাকি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন, সহিহুল জামিইস সগির : ৮৮৭]

সুতরাং অন্তর বিনষ্টকারী বিষয় তথা অসৎ স্ত্রী, মন্দ বাসস্থান ও খারাপ বাহন থেকে নিরাপদ থাকা এবং অনায়াসে রিজিকের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া—এটুকু হলেই মানুষের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী কতই না চমৎকার। তিনি এরশাদ করেন—তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন ঘরে নিরাপদে থাকে, শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে আর তার কাছে একদিনের খাবারের বন্দোবস্ত থাকে, তাকে যেন গোটা দুনিয়াটাই দিয়ে দেওয়া হলো। [সূত্র: ইমাম তিরমিজি এবং ইবনে মাজাহ হাদিসটি বর্ণনা করেন। সহিহুল জামিইস সগির : ৬০৪২]